শিবাম্বুকল্প সার

[AUTO-URINE THERAPY IN A NUT SHELL]

আনন্দ স্বামী

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suyabito Bhante

শিবাম্বুকল্প সার

[AUTO-URINE THERAPY IN A NUT-SHELL]

আনন্দ স্বামী
প্রণীত

প্রথম মুদ্রণ
১৯৮৭
দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত মুদ্রণ
২০০০

প্রাপ্তিস্থান
টিচিং এ্যাপ্লায়েন্স কোং
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

Published by :
P. K. SIRCAR
Teaching Appliance Co.
19 Shyama Charan Dey Street
Calcutta - 700 073

First Edition – 1987
Second Edition - 2000

Price : Rs. 15/- Only.

Printed by :
Mrinal Kanti Sircar
Reliance Offset.
P-65, C. I. T. Road
Calcutta - 700 010

উৎসর্গ

যিনি আমার জীবনের শৈশব থেকে নিজ জীবনের আদর্শ দ্বারা
জীবকে শিব জ্ঞানে সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই পরম-
পূজ্য গৃহীসন্ন্যাসী ব্রহ্মলীন পিতৃদেব আশুতোষ
সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শ্রীচরণে আমার
অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য
উৎসর্গ করলাম।

আনন্দ স্বামী

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
ভূমিকা		vii-xii
	প্রথম অধ্যায়	
১।	মর্ত্যের অমৃত	১
২।	স্বমূত্র চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন	৬
৩।	শিবাম্বুর নবমূল্যায়ন	৯
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
১।	প্রস্তুতি	১৫
	তৃতীয় অধ্যায়	
১।	শিবাম্বুকল্প ও প্রয়োগ বিধি	১৮
	চতুর্থ অধ্যায়	
১।	রোগ প্রতিরোধে প্রয়োগ বিধি	২৪
	পঞ্চম অধ্যায়	
	রোগ নিরাময়ে শিবাম্বু প্রয়োগ	
	(ক) তরুণ রোগে	
১।	জ্বর, সর্দি, কাশি ও পেট খারাপ	২৬
২।	ফোড়া ও কাটা ঘা	২৬
৩।	দাঁতের ব্যথা	২৭
৪।	মাথা ধরা	২৭
৫।	কানের ব্যথা	২৭
৬।	টন্‌সিলের রোগ	২৭
	(খ) পুরাতন ও জটিল রোগে	
১।	হাঁপানী	২৮
২।	অজীর্ণ	২৮

৩। পিত্ত পাথুরী ২৮
৪। যক্ষ্মা ২৯
৫। মধুমেহ ২৯
৬। চক্ষুর রোগ ২৯
ক) চোখ দিয়ে জল পড়া ২৯
খ) চোখ ওঠা ২৯
গ) ক্ষীণ দৃষ্টি ৩০
ঘ) চোখের ছানি ৩০
৭। অর্শ ৩০
৮। ক্যান্সার ৩১
৯। বাত-ব্যাধি ৩১
১০। হৃদ্‌রোগ রক্তচাপ ও হৃদশূল ৩২
১১। ক্যান্সার এবং এইড্‌স রোগে বিশেষ বিধি ৩৩

(গ) বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি

১। পায়োরিয়া ৩৫
২। এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ ৩৫
৩। নেফ্রাইটিস্ ৩৬
৪। মূত্র কৃচ্ছ্রতা ও মূত্র স্বল্পতা ৩৬
৫। স্বপ্ন দোষ ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ৩৬
৬। সর্প দংশন ও বিষাক্ত পোকার কামড় ৩৭
৭। খোলসা ওঠা ৩৭
৮। একশিরা ও কোড়গু ৩৭
৯। বন্ধ্যাত্ব ৩৮
১০। স্থৌল্য ৩৮
১১। কৃশতা ৩৮
১২। সর্তকতা ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। শিশুর ক্ষেত্রে শিবাম্বু বিধি ৪০
২। দৈনন্দিন সমস্যায় মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪১
৩। সুস্বাস্থ্যে ব্যায়ামের বিধি নিষেধ ৪৪

সপ্তম অধ্যায়

১। শিবাম্বুকল্পে খাদ্য নীতি ৪৬
২। নিরামিষ আহারের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ৪৮
৩। শিবাম্বুকল্পে দৈনন্দিন জীবন ৫১

পরিশিষ্ট

শিবাম্বুর শক্তিকরণ (Potentisation of Auto-Urine)

১। শিবাম্বুর শক্তিকরণ প্রণালী ৫৩
২। শিবাম্বুর খাদ্যনীতি ৫৩
৩। শিবাম্বুর বিধির মাত্রা ৫৫
৪। শক্তিকৃত শিবাম্বুর প্রয়োগ ৫৬
৫। পৃথিবীর নানাস্থানে শিবাম্বু-বিধির চিকিৎসা কেন্দ্র ৫৭
৬। শিবাম্বু ব্যবহার কারীদের নিজস্ব মন্তব্য ৫৯

প্রথম মুদ্রণের ভূমিকা

বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রী শান্তিলাল ভট্টাচার্য প্রণীত **"সর্বৌষধি শিবাম্বু"** প্রকাশিত হয়। তারপর থেকেই শিবাম্বুকল্পের প্রতি জনসাধারণের অভাবনীয় আগ্রহে অভিভূত হ'য়ে এই অমূল্য চিকিৎসা পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের জন্য এই তথ্যবহুল পুস্তকখানা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তা ছাড়া প্রচারের সময় স্বল্প পরিসরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ সমস্যা পর্যালোচনার জন্য নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা প্রকাশের জন্য বার বার অনুরোধ আসতে থাকে। সেই চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্যে এই পুস্তকটি প্রণয়নে ব্রতী হয়েছি। আশাকরি, অন্যান্য চিকিৎসা প্রথায় ব্যর্থ হ'য়ে আর কোন চিকিৎসার সাহায্য ছাড়াই প্রত্যেকেই প্রাত্যহিক জীবনে নানা প্রয়োজনে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগে সমর্থ হবেন।

জনসাধারণের পক্ষে শুধু সহজ ব্যবহার প্রয়োজন। ডামরতন্ত্রের অলৌকিক ফলশ্রুতির বর্ণনা তাদের পক্ষে অবাস্তব। এই কথা মনে রেখেই সাধারণের মধ্যে এই চিকিৎসাবিধি সহজভাবে প্রচারের সুবিধার্থে এই পুস্তকখানা রচিত হলো। প্রচারকদের পক্ষেও প্রচার কার্যে তা সহায়ক হবে। এই কারণেই এই চিকিৎসা পদ্ধতির উৎস ডামরতন্ত্র ও তার বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হ'ল না। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা "সর্ব্বৌষধি শিবাম্বু" নামক পুস্তক থেকে তা দেখে নিতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই মহাশয়ের উৎসাহ ও সক্রিয় সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি নানাভাবে আমাকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে এই পুস্তকখানা প্রণয়নে সাহায্য করেছেন। তাঁর অকৃত্রিম প্রেরণা না পেলে **"শিবাম্বুকল্প সার"** পুস্তকটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এই কারণেই তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

বিশেষ ক'রে নিজে ভিন্ন পদ্ধতির চিকিৎসায় ব্যস্ত থাকায় বই লেখার অবসর খুব কম। ইচ্ছা থাকলেও সময়ের ও অবসরের অভাব ইচ্ছাকে কার্যকর করার পথে প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজসেবী ও মানবপ্রেমী শ্রীযুক্ত শান্তিলাল ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে অবিরত উৎসাহ না

দিলে হয়ত এই বই কোনদিনই হ'য়ে উঠত না। তিনি নিজে বহুদিন যাবৎ শিবাম্বুকল্প দ্বারা সমাজসেবা ক'রে আসছেন। এই পুস্তক রচনা তাঁরই নিয়ত প্রেরণার ফসল। এই জন্য তাঁর কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ।

তা ছাড়া, শ্রীযুক্ত পীযূষ কান্তি সরকার মহাশয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নানা দুর্যোগ সত্ত্বেও আমাকে যেভাবে এই শিবাম্বুকল্প সার পুস্তকটি লেখার জন্য নানা ভাবে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে এসেছেন তা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। তাঁরই অকৃত্রিম সাহায্যে এই পুস্তকটি এত দ্রুত প্রকাশিত হ'তে পেরেছে। তাঁরই পরামর্শে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে শিবাম্বুকল্পের ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হ'ল। এতে চিকিৎসক মহলে নূতন চিন্তাধারার আবির্ভাব হবে এবং জনকল্যাণকামী সরকার চিকিৎসার বিকল্প পদ্ধতি উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ হবেন। এজন্য প্রকাশকের কাছে আমি অশেষ ঋণী।

পরিশেষে, কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার অপরাধ হবে অমার্জনীয়। তাঁরা শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই চিকিৎসাবিধি প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হননি, বহুক্ষেত্রে তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফল আমাকে জানিয়ে আমায় চিরকৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। অনেক সময় জটীল দুরারোগ্য রোগীকে আমার নিকট পাঠিয়ে আমার গবেষণায় সাহায্য করেছেন। তাঁদের বিশেষ অনুরোধে নাম উল্লেখ না ক'রে তাঁদের নিকট আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

অন্যান্য চিকিৎসকদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁরাও যেন মুক্ত মন নিয়ে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন ক'রে আর্তমানবের অশেষ কল্যাণে সাহায্য করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আমরা কৃতার্থ হবো। আমরাও সত্যদর্শী ঋষিদের মত প্রার্থনা করি ঃ

সর্বেহত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখমাপ্নুয়াৎ॥
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

—আনন্দ স্বামী

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত মোরারজী দেশাইকে আমার লেখা শিবাম্বুকল্প সারের প্রথম সংস্করণ দেখাবার পর তিনি আমাকে পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্য বহুল বইটি লেখার নির্দেশ দেন। যার দামও হবে কম। কিন্তু এ বই প্রকাশের পর উনি ঐটিকে আরো কিছু বিষয়ের (মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার) সংযোজন করার উপদেশ দেন কিন্তু নানা কারণে তা তখন হয়ে উঠল না। ফলে পাঠকদের দিক থেকে নানারূপ তাগিদ আসা সত্ত্বেও আমি কিছু করে উঠতে পারিনি। এদিকে আরো একটি কারণ এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী।

আমি চিরদিনই যোগের প্রচারক। এ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় ১৯৭২ সনে একদিন নাট্যাচার্য স্বর্গত মন্মথ রায় (যাঁকে মন্মথ দা বলে ডাকতাম) আমার কাছে এসে বললেন মানব কল্যাণই যখন তোমার উদ্দেশ্য তখন যোগ ভিন্ন অন্য কোন পন্থাদ্বারা আর্তমানবের কল্যাণ করার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ যা সকল মানুষের পক্ষে সব অবস্থায় অনুসরণ করা সহজ হবে। যোগ সকলে করতে পারবে না। তার জন্য সময়, শিক্ষক ও অবসরের প্রয়োজন। কিন্তু যদি এমন কোন বিধান দিতে পার যা শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ যে কোন অবস্থায় বিনা ব্যয় ও বিনা শিক্ষায়, বিনা পরিশ্রমে অনুসরণ করতে পারে তবে তা হবে সত্যিকারের মানব কল্যাণ। আমি বললাম, "তা কখনও সম্ভব নয়।" তখন তিনি বললেন—"হ্যাঁ তা সম্ভব এবং আমি তা তোমায় বলবো'। দুদিন পরে তিনি তার সহকারী আশুবাবুর হাত দিয়ে কাগজে মোড়ান একখানা বই পাঠিয়ে দিলেন। কাগজ ছিঁড়ে বইটি বের করে দেখলাম বইটি বিলেতে থেকার স্পিঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত, নাম "Water of LIfe", লেখক J. W. Armstrong। প্রবল ঔৎসুক্যে বইটি পড়ে দেখলাম। বইয়ের বিষয় এবং প্রয়োগ পদ্ধতি অভিনব। বিশ্বাস করা যায় না অথচ বর্ণনা দেখে এবং বইটির প্রচার সংখ্যা দেখে অবিশ্বাসও করতে পারলাম না। প্রথমে নিজের উপর প্রয়োগ করে প্রাথমিক মূল্যায়ণ করবো ঠিক করলাম। কিন্তু ভয় লাগলো প্রচণ্ড, দেহের সমস্ত বিষ বেড়িয়ে যাচ্ছে তা যদি আবার দেহে প্রবেশ

করানো যায় তবে মৃত্যু অবধারিত। তবে নিজের উপর প্রয়োগ না করে অপরকে উপদেশ দেওয়া যায় না। তাই একদিন সকল সঙ্কোচ ও ভয় উপেক্ষা করে নিজের উপর প্রয়োগ করে দেখলুম ভয় শুধু সংস্কারগত। পরে নিজের উপর বার বার প্রয়োগ করে দেখলুম দীর্ঘ দিন যোগ করে যে ফল পেয়েছি শিবাম্বু অল্প দিনের মধ্যেই তার চেয়েও বেশি সুফল দিয়েছে, মন্মথদাকে সব কথা বললাম। তিনি বললেন এবারে প্রচারে নেমে পড়। কথা দিলাম। সেই সময় শ্রদ্ধেয় শান্তিলাল বাবু আমাকে "সর্বৌষধি শিবাম্বু" বইটিকে সর্বজন গ্রাহ্য আকার দিতে বললেন। বইটির তৃতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতন রূপে প্রকাশিত হল। ঐ সংস্করণটি অভূতপূর্ব সাড়া জাগাল। আমি কৃতার্থ বোধ করলাম। কিন্তু মন্মথদার অবদানের স্বীকৃতি "সর্বৌষধি শিবাম্বু" বা "শিবাম্বু কল্পসার" কোথাও উল্লেখ করলাম না। ফলে মন্মথদার মৃত্যুর পূর্বে যখন তার সঙ্গে গল্প করতে গেলাম তখন তিনি বললেন শিবাম্বুর উপর—আন্তরিক নিষ্ঠায় আমি মুগ্ধ কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। তুমি কোন বইতেই তোমার এই অভিনব প্রচেষ্টার পিছনে আমার অবদানের স্বীকৃতি দাওনি। তোমার প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেও অন্তর থেকে শুভেচ্ছা জানাতে পারলাম না। আমি অপরাধ স্বীকার করে বললাম আমি বই লেখার সময় এই কথা মনে করেছি কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার অবস্থানের কথা মনে করে এই কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম। বিদগ্ধ সমাজে আপনিও শিবাম্বু নামক ঘৃণ্য পদ্ধতির উৎসাহ দাতা জেনে নানা জনে আপনাকে নানা ভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় দেখতে পারে মনে করে ঐ ব্যাপারটা উল্লেখ করিনি। কারণ মোরারজী ভাইয়ের উৎসাহের কথা কোন প্রসঙ্গে বললেই শ্রোতা বলে উঠতেন ওর কথা ছেড়ে দিন। ওর মাথায় প্রস্রাবের সায় তাই এসব কথা মনে করেই আপনাকেও যাতে এই পরিস্থিতিতে পড়তে না হয় সেই জন্যেই ঋণের স্বীকৃতি চেপে গেছি, তখন উনি বললেন—'না, আমি এই প্রচারে খুশীই হবো—তোমাকেও বেশি করে আশীর্ব্বাদ করবো।' মন্মথদার শোকাবহ আকস্মিক প্রয়াণে আমি তার ঋণের স্বীকৃতি কোন বইয়ের ভূমিকাতেই দেখাতে পারলাম না। এই কারণেই মনে মনে ঠিক করেছিলুম "শিবাম্বুকল্প সার"এর আর কোন সংস্করণই করবো না। নূতন করে কোন বই লিখে মন্মথদার ঋণের স্বীকৃতি দিব। কিন্তু

পুস্তকের প্রকাশক পীযূষ বাবু অত্যন্ত অনুরোধ করায় মন্মথদার ঋণের স্বীকৃতি দিয়ে "শিবাম্বুকল্প সার"এর দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্ধিত আকারে লিখতে রাজী হলাম। কিন্তু মনের ক্ষোভ থেকেই গেল যে আমার গুরুর কাছে তার ঋণের স্বীকৃতি দেখাতে পারলাম না।

এই দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু নূতন রোগের চিকিৎসার কথা ছাড়াও প্রয়োগ পদ্ধতির কিছু বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমি প্রয়োগ করে যাতে বেশি ফল পেয়েছি সে সব বিষয় এখানে উল্লেখ করেছি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এ ব্যাপারে অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক উৎসাহ নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধিতে নিজেরা প্রয়োগ করে ক্ষেত্র বিশেষে আমার কাছে রোগী পাঠিয়ে আমাদের পরীক্ষায় সাহায্য করেছেন। এটা বুঝতে পারা গেছে যে শিবাম্বু কল্প এখন আর লজ্জা বা ঘৃণার বিষয় নয়। আগে এই বই কিনতে এসে গ্রাহক বইয়ের দোকানে গিয়ে বইয়ের নাম কাগজে লিখে দেখাত। এখন সকলের সামনেই বইয়ের খোঁজ নেয়। শুধু তাই নয় পত্র পত্রিকার মারফৎ জানতে পারা গেছে যে এখন অনেক স্থানেই "শিবাম্বু চিকিৎসা কেন্দ্র" খুলে প্রচার পত্র বিলি করা হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই এই বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে। পূর্ব এশিয়ার চীন ও জাপানে এর প্রচার সব চেয়ে বেশি। জাপানে এ বিষয়ে গভীর ভাবে গবেষণা চলছে। সকলেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসার ভয়াবহ পরিণামের কথা জেনে এই সরল চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণে এগিয়ে এসেছেন। কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন শিবাম্বু প্রয়োগে প্রার্থিত ফল পাওয়া না গেলেও অপকার কিছু হবে না। কিন্তু এলোপ্যাথিক ঔষধে আপাততঃ উপকার করলেও পরবর্তী স্তরে তার সুদূরপ্রসারী অপকার এড়ান সম্ভব নয়। তাই এই সরল ও সহজ প্রাকৃতিক চিকিৎসার দিকে মানুষ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। অভাবনীয় ফল পেয়ে বিনা ব্যয়ে কঠিন কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হচ্ছে। তবে কোন চিকিৎসা পদ্ধতিই সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না যদি তাতে সরকারী আনুকুল্য না থাকে। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ সরকার তার হাসপাতালে একটি পৃথক বিভাগ খুলে ইচ্ছুক রোগীদের উপর এই চিকিৎসা বিধি প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে ব্যাপক ভাবে

বিনা ব্যয়ে এই পদ্ধতি ইচ্ছুক রোগীদের উপর প্রয়োগ করতে পারা যাবে। এতে সরকারের ব্যয় হ্রাস পাবে এবং একই সময়ে চিকিৎসার ব্যাপকতায় অনেক বেশী মানুষ রোগ মুক্ত হতে পারবে। আশা করি লোকতান্ত্রিক সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন।

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে অহেতুক দেরী হয়ে গেল কিন্তু তা ইচ্ছাকৃত নয়। নিজের শত সদিচ্ছা থাকলেও আমার ও আমার পরিবেশকের যে সব অকল্পনীয় দুর্বিপাক একের পর এক করে নেমে এলো তাতে এই সংস্করণ শেষ করার কোন আশাই ছিল না। তবু দেবাদিদেব মহেশ্বরের অপার অনুগ্রহে তা শেষ করতে পেরেছি। তবে সমস্ত অন্ধকার ভাবী আলোর সঙ্কেত। তাই দেরী হওয়াতেও আমি অনেক লাভবান হয়েছি।

প্রথমে ভারতে এই আন্দোলনের পথিক ডাঃ জি. কে ঠক্করের এই আন্দোলনের মুখপত্র Wonder of Uropathy বইটি আমার হাতে আসে। উনি একজন ব্যবহারজীবী হয়েও তার সমস্ত কাজ ছেড়ে উনি এই আন্দোলনে নেমে পড়েন। তিনি যে প্রতিষ্ঠান করেন তা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৯২ সনে গোয়ায এই প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। তা' ছাড়া উনি অন্যান্য আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে সর্বদা ভারতের পক্ষ হয়ে যোগ দেন।

Corn Vander Kroom এর লেখা The Gold Fountain–The Complete Guide to Urine Theraphy এই পুস্তকে পৃথিবীর নানা দেশে কী ভাবে এই শিবাম্বুকল্প ব্যাপকভাবে প্রচলিত তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি তিব্বতের লামাদের আশ্রমে ঘুরে ডামরতন্ত্রের সাক্ষাৎ পান। পরে চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বত্রই এই শিবাম্বু কল্পের বহুল প্রচার প্রত্যক্ষ করেছেন। সম্ভবতঃ ঐ সব দেশে বৌদ্ধগণ হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচার আচরণ পরিত্যাগ করলেও তান্ত্রিক দিকটা গ্রহণ করেছিলেন। এই কারণেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শিবাম্বুর প্রচলন দেখা যায়।

প্রকাশনায় বিলম্ব হওয়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখ বোধ করছি। ইতি—

বিনীত

আনন্দ স্বামী

প্রথম অধ্যায়

মর্ত্যের অমৃত

মহাভারতের সমুদ্র-মন্থনের উপাখ্যান সকলেরই জানা। দেবগণ ও দানবদের সমবেত প্রচেষ্টায় সমুদ্র থেকে উঠল অমৃত ও হলাহল। বিশ্বচরাচর রক্ষার জন্য দেবাদিদেব মহাদেব বিষ নিজ কণ্ঠে ধারণ ক'রে দেবতাদের অমরত্ব দান করতে তাদের হাতে তুলে দিলেন অমৃত। সেই থেকেই শুরু হল দেবদানবের অবিরাম সংগ্রাম।

সমুদ্র-মন্থন আখ্যায়িকাকে রূপক রূপে ব্যাখ্যা করা যাক। কারণ দেবগণ কখনই স্বার্থপর ও নির্দয় হ'য়ে মর্ত্যের অমৃত স্বর্গে অপহরণ ক'রে নিয়ে মর্ত্যবাসীর জন্য শুধু মৃত্যু যাতনা রেখে অমৃতের পূর্ণভাগ নিজেরাই ভোগ করেননি।

রূপকভাবে আমাদের এই দেহকেই ধরা যাক এই ভূমণ্ডল রূপে। সৃষ্টির পঞ্চভূতের লীলাভূমি এই মানবদেহ। পৃথিবীর মত মানবদেহেরও প্রায় তিন ভাগ জলীয় অংশ এবং এক ভাগ মাত্র স্থল ভাগের মত মেদ, মজ্জা, মাংস ও অস্থি দ্বারা গঠিত। এখানে সমুদ্রের মাঝে মৈনাক পর্বতের মত হৃদ্‌পিণ্ড প্রতিনিয়ত রক্ত সমুদ্র (সমুদ্রের মত লবণাক্ত) মন্থন করে চলেছে। তার দুই প্রান্ত থেকে দুই রজ্জুর মত ধমনী ও শিরার মাধ্যমে টান চলেছে প্রতিনিয়ত। এই মন্থন থেকে যে বিষ বেরিয়ে আসে তা শিরার মাধ্যমে ফিরে আসছে আর অমৃতরূপী বিশুদ্ধ রক্ত দেহের সর্বত্র প্রাণ শক্তি প্রবাহিত করছে। আবার ঐ রক্ত-সমুদ্রের স্রোত বৃক্কের (Kidney) মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে অমৃতে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির দোষে ঐ অমৃতকে বিষরূপে পরিত্যাগ ক'রে নানা রোগে আমরা মৃত্যু যাতনা ভোগ ক'রে থাকি। অবশ্য ঐ অমৃতের সঙ্গে কিছু বিষও থাকে। কিন্তু তা অমৃতের সংস্পর্শে বিষরূপ পরিত্যাগ করে আমাদের দেহে অমৃতের কাজ ক'রে থাকে। ঐ নির্যাস উদরে প্রবেশ ক'রে রোগ প্রতিরোধী

শক্তিতে রূপায়িত হ'য়ে আমাদের দেহে অমৃতের কাজ করে ও রোগের মৃত্যু যাতনা থেকে আমাদের রক্ষা করে। পরম করুণাময় মহাদেব ডামর তন্ত্রের ১০৭ শ্লোকে সেই অমৃতের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন।

সৃষ্টিকল্পে মানবের আবির্ভাব দিব্যজীবনের অধিকারী রূপে। সে পশু মানবরূপে জন্ম নিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন হ'য়ে নরমানবে রূপায়িত হয়। পরে সাধনার বলে ব্রহ্মমানবে উন্নীত হ'য়ে মানব জীবনের চরিতার্থতা লাভ করে। এই জন্যই ঋষিগণ মানব সমাজকে সম্বোধন করেছেন, "অমৃতস্য পুত্রাঃ" রূপে।

মর্ত্যের এই অমৃতকে ডামর তন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে শিবাম্পু রূপে। শিবাম্বু দ্বারা চিকিৎসা করার প্রণালীকে বলা হয়েছে **'শিবাম্বুকল্প'**।

প্রস্রাবের শিবাম্বু নামকরণের পিছনে গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে। যারা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের পিছনে একমাত্র কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না তারা এই সামান্য একটি সাধারণ জিনিষের নামকরণের পিছনে আধুনিক দেহ বিজ্ঞানের (Physiology) গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞানের অসাধারণ গভীরতার পরিচয়ে অভিভূত হবেন।

আমরা সাধারণভাবে জানি যে, রক্ত বৃক্কের (Kidney) মাধ্যমে পরিস্রুত হ'য়ে প্রস্রাবে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এজন্য প্রস্রাবের নাম শিবাম্বু হবে কেন?

দেহ বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রই জানেন যে, বৃক্কের প্রস্রবণের (filtration) কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় পশ্চাৎ পিটুইটারী গ্রন্থির (Posterior Pituitary gland) সক্রিয়তায়। পিটুইটারী গ্রন্থির যৌগিক নাম শিবগ্রন্থি। সুতরাং শিবগ্রন্থির অনুগ্রহে যে জল বা অম্বু পাওয়া যায় তাকে আমরা শিবাম্বু ছাড়া আর কি বলতে পারি? শিব অর্থ মঙ্গল, তাই শিবাম্বুর মানে দাঁড়ায় সর্ব অমঙ্গল বা দুঃখ নাশক ঔষধি, তাকেই আমরা বলবো মর্তের অমৃত। এই কারণেই প্রস্রাবের যৌগিক নাম শিবাম্বু।

ডামর তন্ত্রের শিবাম্বুকল্প সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে অত্যন্ত গুপ্ত ভাবে। বাউল, শৈব ও নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে। তা ছাড়া হটযোগী ও তান্ত্রিকদের কেউ কেউ এই প্রকল্পের সাহায্যে দেহ রোগ মুক্ত ক'রে দেহকে কঠোর সাধনার উপযুক্ত ক'রে নেন। হিমালয়ের গভীর গুহায় যে সব মহাযোগী দীর্ঘ দিন

তপস্যায় কাটান তারাও দেহকে সমস্ত ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখার জন্য এই প্রকল্পের আশ্রয় নেন। বিগত দিনে কাশীর সচল শিব তৈলঙ্গস্বামী সকলের সামনেই স্বমুত্র পান ক'রে একে বলতেন "গঙ্গোদকম্"। কারণ বিশুদ্ধ মূত্র গঙ্গার জলের মতই সামান্য লবণাক্ত এবং পবিত্র। তাই এই অতি গুহ্য বিদ্যা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হ'য়ে গ্রহণীয় হওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই ভগবানের বিশেষ শুভ উদ্দেশ্য রয়েছে।

যদিও শিবাম্বুকল্প সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় অবদান তবু এর আধুনিক ব্যাপক প্রচারের জন্য আমরা একজন ইংরেজের কাছে ঋণী। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে কামলা রোগে (Jaundice) গোমূত্রের ব্যবহার অনেক দেশেই অনেক দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। বিশেষ ক'রে গ্রীক দেশে শিবাম্বু কল্পের ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। প্রাচীন সাহিত্যের নানা স্থানে তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্লীনিয়াস (Plinius) ও গেলেন (Galen) প্রাচীন গ্রীক দেশে প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্বমূত্র ব্যবহারের পক্ষে তাঁরা মত প্রকাশ ক'রে গেছেন। তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায়, অতীতে গ্রীক দেশে শিবাম্বু বিধির ব্যাপক প্রচার ছিল।

আমাদের দেশেও আয়ুর্বেদে বিভিন্ন প্রাণীর মূত্রকে ঔষধরূপে ব্যবহারের বিধান আছে। তার ভিতরে নরমূত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। একে বলা হয়েছে রসায়ন অর্থাৎ জীবনীশক্তি বর্ধক —

নরমূত্রং গরং হন্তি সেবিতন্তদ্রসায়নম্।
রক্ত পামাহরং তীক্ষ্ণং সাক্ষার লবণং স্মৃতম।

(আয়ুর্বেদ-ভাবপ্রকাশ)

অর্থাৎ নরমূত্র বিষনাশক তীক্ষ্ণ ঝাজ্‌যুক্ত, রক্তদোষ নাশক, চর্মের পামা রোগ (eczema) নাশক এবং জীবনীশক্তি বর্ধক রসায়ন।

চীন দেশে বিষাক্ত ক্ষত চিকিৎসায় মূত্রের ব্যবহার সুদূর অতীত থেকেই প্রচলিত আছে। এই সব তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে হোমিওপ্যাথিতে মূত্রের ঔষধরূপে ব্যবহারের নির্দেশ কেউ কেউ দিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউই অগ্রণী হ'য়ে শক্তিকৃত মূত্রের ব্যবহার নিয়ে এগিয়ে আসেননি। তারা ঔষধরূপে ব্যবহৃত মূত্রের নাম দিয়েছেন URINUM।

আধুনিক কালে মূত্রকে ঔষধরূপে প্রথম ব্যবহার করেন জার্মানীর প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ কুট হের্জ। তিনি ১৯২৯ সনে প্রথমে এই চিকিৎসা পদ্ধতির পরীক্ষা শুরু করেন। উনি রোগীর শেষ রাতের প্রথম প্রস্রাবের নির্যাস নিয়ে ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জের সাহায্যে চামড়ার নীচে চালিয়ে দিতেন। তাতে দেখা গেল যে, যে সব ব্যাধি অন্য কোন ঔষধে নিরাময় হচ্ছিল না সে সব রোগ এই পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে আরোগ্য লাভ করছিল। এই পরীক্ষায় উৎসাহিত হ'য়ে তিনি Association of Medical Practitioners in Bavaria-কে তাঁর পরীক্ষার খুঁটিনাটি প্রবন্ধ আকারে পাঠান। কিন্তু স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ তাঁর এই পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে আইনের ভয় দেখিয়ে পরীক্ষার অগ্রগতির পথ বন্ধ ক'রে দেয়। ফলে তাঁর সহকর্মী সকলেই ভয়ে ভয়ে সরে যান। ডাঃ হের্জ তাঁর গবেষণা লব্ধ তথ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে দেখিয়েছেন কিভাবে স্বমূত্র চিকিৎসায় দেহের অতি-প্রয়োজনীয় উপাদান অতি সহজে দেহে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে রোগ নিরাময় ক'রে দেহের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। তাঁর পরীক্ষা সব চেয়ে বেশী কার্যকরী হয়েছিল যক্ষ্মা ও ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রচলিত আইনের বিধি-নিষেধের প্রতিবন্ধকতায় ভগ্নহৃদয়ে তিনি তাঁর গবেষণা অসমাপ্ত রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তারপর আর কেউ তার অসমাপ্ত কাজ শুরু করতে সাহসী হলেন না। তবে হের্জের গবেষণা থেকে জানতে পারা গেল যে— প্রোটিন, ভিটামিন ও পাচকরসের অভাব এবং হর্মোনের অপ্রতুলতা স্বমূত্র চিকিৎসায় অতি সহজেই নিরাময় হয়। তা ছাড়া, তিনি বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফল বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রে গেছেন।

আধুনিক কালে শিবাম্বুর ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হয় J. W. Armstrong এর Water of Life —নামক পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই। Mr. Armstrong-এর আবিষ্কার কিন্তু আকস্মিক ভাবেই হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে ধর্ম চর্চায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেবার জন্য তৈরী হলেন। দিন রাত্রি শুধু ধর্মালোচনার জন্য বাইবেল নিয়ে পড়তেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর। একদিন পড়তে পড়তে বাইবেলের Command V-এ মানুষের প্রতি

ভগবানের বাণী দেখতে পেলেন— ''Drink water of thy own cistern''। অনেক চিন্তার পর তিনি ধরে নিলেন যে, প্রত্যেকের নিজস্ব জলাধার বলতে মূত্রাশয়কে (bladder) বুঝাচ্ছে এবং জল বলতে স্বমূত্রকে নির্দিষ্ট করছে। সেই ধারণা অনুসারে তিনি নিজের উপর স্বমূত্র চিকিৎসা আরম্ভ করলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রোগমুক্ত হ'য়ে নূতন জীবন লাভ করলেন। এই অভিনব পদ্ধতিতে আরোগ্য লাভ করার পর তাঁর স্বাভাবিক বয়স থেকে তাঁকে অনেক কম বয়স্ক মনে হল। তাঁর ডাক্তারগণ হতবাক্। নিজে আরোগ্য লাভ ক'রে অন্যান্য অসাধ্য রোগীর উপর তাঁর নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে তিনি আশাতীত ফল পেলেন। তারপরই তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলের ভিত্তিতে তিনি ''Water of Life'' বইখানি লিখে সমস্ত জগতে একটা বিতর্কের প্রবল ঝড় তুললেন। তাঁর স্বপক্ষের যুক্তিগুলি প্রত্যক্ষ প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বিপক্ষের যুক্তি শুধু অন্ধ সংস্কারে আচ্ছন্ন।

''Water of Life'' প্রকাশের পর গুজরাটের 'ভারত সেবক সমাজ' এই অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এই চিকিৎসা পদ্ধতি নিজের উপর প্রয়োগ ক'রে অভিভূত হন। তাঁর কঠিন ও দুরারোগ্য কোষ্ঠকাঠিন্য অতি অল্প দিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়। তখন থেকেই তিনি এই শিবাম্বুকল্প প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। একে তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। শতবর্ষের শেষ দশকে এসেও তিনি সেই ব্রত সমানে চালিয়ে গেছেন। নিজের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার ছাড়াই শুধু মাত্র শিবাম্বু প্রয়োগে নিরাময় করেন। এই লেখককে তিনি নানা ভাবে সর্বদাই উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। 'ভারত সেবক সমাজ' থেকে প্রকাশিত রাওজী ভাই মণিভাই প্যাটেল লিখিত ''মানব মূত্র'' গ্রন্থখানি ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় ভারতের সর্বত্র প্রচারিত। বাংলা ভাষায় শান্তিলাল ভট্টাচার্য প্রণীত এই চিকিৎসা বিধি ''সর্বৌষধি শিবাম্বু'' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

শিবাম্বুকল্প অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ —

১) বিনা অর্থব্যায়ে এই চিকিৎসা গ্রহণ করা যায়। সকলের পক্ষেই এই পদ্ধতি সহজ সাধ্য।

২) অন্যান্য চিকিৎসা বিধিতে যেমন রোগ নির্ধারণের সঙ্গে ঔষধ নির্বাচনের

বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে এখানে তার অবকাশ থাকে না। কারণ সকলকেই একই পদ্ধতিতে শিবাম্বু ব্যবহার করতে হয়।

৩) অন্যান্য পদ্ধতিতে ঔষধ সঠিক নির্বাচন হলেও মাত্রায় কম বেশীতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অনেক সময় রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই কারণ ঔষধ হিসাবে যা গ্রহণ করা হচ্ছে তা দেহেরই উৎপন্ন পদার্থ তাই তা থেকে কোন প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে না।

৪) অন্যান্য চিকিৎসায় ঔষধ সংগ্রহ একটা সমস্যা। অর্থের সংস্থান হলেও অসময়ে ঔষধ পাওয়া অসম্ভব হয়। কিন্তু এখানে ঔষধ সর্বদা সহজ লভ্য। যদি রোগের প্রকটতায় রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হ'য়ে থাকে তবে অন্য কোন সুস্থ লোকের মূত্র দিয়েই চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়।

তবে শিবাম্বু প্রয়োগ বিধি শুধু প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থেই দেখা যায়। তাই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে তবে কি এই বিধি শুধু কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত? তারই উত্তর দেওয়া হল।

❑ স্বমূত্র চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ❑

স্বমূত্র চিকিৎসার উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ প্রয়োগে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই একে অন্ধ বিশ্বাসের ফসল হিসাবে মনে করেন। তাঁদের মতে, এই চিকিৎসা শুধু ক্ষতিকর নয় পরিণামে মানব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। কারণ —

১) মূত্র দেহ পরিত্যক্ত বিষ। সুতরাং ঐ বিষ (যা দেহ নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য পরিত্যাগ করেছে) যদি পুনরায় দেহে প্রবেশ করানো যায় তবে অচিরে দেহ বিষাক্ত হ'য়ে মৃত্যু মুখে পতিত হবে।

এই আপত্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তিগ্রাহ্য নয়। দেহের পরিত্যক্ত পদার্থ সর্বদাই দেহের ক্ষতিকর হয় না। গাছের শুকনো পাতা গাছ থেকে প'ড়ে গিয়ে কালক্রমে পচে ঐ গাছেরই সার হ'য়ে পুষ্টি জোগায়। দেহে রোগবীজ বিশেষ পদ্ধতিতে পুনরায় দেহে প্রবেশ করালে আক্রান্ত দেহকে রোগমুক্ত করে। সুতরাং মূত্রের সঙ্গে যে সব রোগবীজ বেড়িয়ে যায় তা পুনরায় দেহে গিয়ে রোগ প্রতিরোধী (antibody) শক্তিতে রূপায়িত হ'য়ে দেহকে রোগমুক্ত করে। পাশ্চাত্য

চিকিৎসায় auto-vaccine -এর কথা আমরা সবই জানি।

২) মূত্রের গন্ধ ও স্বাদ ঔষধরূপে ব্যবহারের পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা এবং অন্ধ সংস্কার থেকে উদ্ভুত। মূত্রকে দূষিত ও অপবিত্র মনে ক'রে দীর্ঘদিন ধ'রে যে সংস্কার মনে রয়েছে তা থেকেই এই অভিযোগ হয়েছে। সুস্থ লোকের টাট্‌কা মূত্রে কোন গন্ধ থাকে না। বাসি প্রস্রাবে ammonia হয় ব'লে উগ্র গন্ধ হয়। প্রস্রাবের স্বাদ একটু নোন্‌তা। নোন্‌তা খাদ্য আমরা সর্বদাই খাই। কিছুদিন শিবাম্বু পান করার পর কিড্‌নির পরিস্রবণ ক্ষমতা এত বেড়ে যায় যে, তখন আর সেই নোন্‌তা স্বাদও থাকে না। ঠিক পরিস্রুত জলের মত (distilled water) পরিষ্কার হয়। আমরা যদি বিজাতীয় স্বাদের allopathic mixture নাক বন্ধ ক'রে খেতে পারি তবে হাসি মুখে কেন নিজের প্রস্রাব পান করতে পারবো না?

৩) সুস্থ ব্যক্তির প্রস্রাব ক্ষতিকর না হলেও রুগ্ন ব্যক্তির প্রস্রাব রোগকে মারাত্মক রূপ দিবে। এই অভিযোগ অসত্য। দেখা গেছে, রুগ্ন ব্যক্তির মূত্র তার দেহে রোগ প্রতিরোধী শক্তি উৎপন্ন ক'রে সত্ত্বর রোগারোগ্যে সাহায্য করে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূত্রে অতি প্রয়োজনীয় হর্মোন বৃদ্ধি পায়, তখন সেই মূত্র থেকে সেই সব হর্মোন সংগ্রহ ক'রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। গর্ভবতী নারীদের প্রস্রাব থেকে এরূপ হর্মোন পাশ্চাত্য দেশে সংগ্রহ করা হ'য়ে থাকে।

৪) রোগবীজ শরীরে গিয়ে যে রোগারোগ্যে সাহায্য করে তার একটি সর্বজন প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমরা দেখেছি যে, ইতর পশুদের গায়ে যদি কোন গভীর ক্ষত হয় তবে তারা ঐ ক্ষতস্থান সর্বদা জিভ দিয়ে চাট্‌তে থাকে। ঐ জিভের মাধ্যমে ক্ষতের জীবাণু শরীরে গিয়ে অতি সত্ত্বর ঔষধ ছাড়াই ক্ষতকে নিরাময় ক'রে দেয়। যে সব ক্ষত তাদের জিভের নাগালের বাইরে থেকে (যেমন মাথার উপর) সে সব ক্ষেত্রে ঐ ক্ষততেই ঐ পশু মারা যায়।

তবে কেন অমৃতে অরুচি?

কারণ আজীবন সংস্কার থেকে আমরা জেনে এসেছি যে, শিবাম্বু অতি বিষাক্ত ও অত্যন্ত অপবিত্র। তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি এই অন্ধ সংস্কারকে সহজে

দূর করতে পারবে না। এই সংস্কার এত অন্ধ যে, যুক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না।

এবার তা হলে বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতিকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করি। আমরা রোগ নিরাময়ে প্রচলিত ঔষধ ব্যবহার ক'রে থাকি। প্রতি ঔষধের শিশির গায়ে ঔষধের একটা মাত্রা লেখা থাকে। তার অর্থ, ঐ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ঐ ঔষধ বিপজ্জনক হবে। তা হলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, ঐ ঔষধ প্রকৃতপক্ষে বিষ—নির্দিষ্ট মাত্রায় রোগ জীবাণু নষ্ট করার পর আমাদের দেহের হয়ত ততটা ক্ষতি করবে না। কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে রোগ ও রোগী দুজনেরই সর্বনাশ করবে। রোগ জীবাণুরও প্রাণ আছে, সুতরাং যেই "ঔষধ" ক্ষুদ্রের প্রাণ নাশ করে সেই ঔষধে বৃহতের প্রাণেরও সমূহ ক্ষতি করবে। এটা কি খুব বেশী যুক্তি দিয়ে বুঝানো দরকার?

বিশেষতঃ এন্টিবায়োটিক ঔষধের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা শুধু দেহের রোগ-জীবাণুই ধ্বংস করে না তারা দেহের অনেক রক্ষাকারী জীবাণুকেও ধ্বংস করে দেয়। দেহের ভিতরে কিছু কিছু জীবাণু আছে যারা আমাদের পরিপাক ক্রিয়া ও দেহ পোষণের সহায়ক। ঐসব 'এন্টিবায়োটিক' হিতকারী জীবাণুকে নষ্ট করে বলে ঐসব ঔষধের বিষক্রিয়া কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করার জন্য ঐসব চিকিৎসার সময় কিছু কিছু "ভিটামিন" আনুষঙ্গিক হিসাবে খেতে চিকিৎসকগণ বলে থাকেন। তা হলেই বুঝুন, চিকিৎসার নামে আমরা অনেক সময়েই নিজেদের কতটা ক্ষতি করে থাকি। তবে সেই কারণে ঐসব চিকিৎসা গ্রহণ করতে কখনই নিষেধ করবো না। যখন রোগাক্রমণে জীবন বিপন্ন হবে তখন নিশ্চয়ই ঐসব চিকিৎসার সাহায্য নিতে হবে। এই কারণেই এই সব ঔষধ জরুরী অবস্থার জন্যই মজুত রাখা দরকার। তবে একথা জেনে রাখতে হবে যে, শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করলে সেরূপ জরুরী অবস্থা কখনই আসবে না।

এবার ধরুন, আর এক প্রকার ঔষধের কথা যা মলমের মত চামড়ার উপর মালিশ করতে হয়। ঐসব মলম বা বাহ্যিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন "লোশনের" গায়ে একটি সাবধানবাণী সর্বদাই লেখা থাকে। তা হচ্ছে, "বিষ" অথবা Poison "কখনই খাবেন না" (Not to be taken internally)।

ঔষধ যদি বিষ হয় তা চামড়ার উপর প্রয়োগ করবো কেন? লোমকূপের মধ্য দিয়ে তাও দেহের মধ্যে প্রবেশ করে রক্তস্রোতে মিশে শরীরকে বিষাক্ত করে দেবে। তা হলে এই বিষ গ্রহণের যৌক্তিকতা কি? এর একটিই মাত্র যুক্তি—রোগবীজকে মেরে ফেলা। রোগ-জীবাণুর ক্ষীণ প্রাণ যে পরিমাণ বিষে মারা যাবে মানুষের "বৃহৎ প্রাণে" তার ক্ষতিকর প্রভাব ততটা পড়বে না। কিন্তু প্রয়োগ কর্তা কখনই বলতে পারবেন না যে, ঐ ঔষধে শুধু রোগকেই নির্মূল করবে দেহের উপর তার কোন ক্ষতিকর প্রভাবই পড়বে না।

এসব দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা জীবন রক্ষার জন্য ঔষধ হিসাবে যে সব বস্তু গ্রহণ করে থাকি তা প্রকৃত পক্ষে বিষ। জীবনকে তা তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। তবুও আমরা সেই বিষকেই গ্রহণ করি। শুধু গ্রহণই করি না, তার ব্যবস্থাপত্র পাওয়ার জন্য শত শত টাকা খরচ করে ঘটি বাটি বন্ধক দিয়ে বিশেষজ্ঞের আশ্রয় নিই। এসব শোনার পর কি সত্যিই মনে প্রশ্ন জাগে না—আমরা কতটা সভ্য ও বুদ্ধিমান হয়েছি? এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের কলিটি মনে পড়ে—

"আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।" না, সবাই আর জেনে শুনে বিষ পানে রাজী হচ্ছেন না। তাই তাদের শুরু হয়েছে নূতন ভাবনা। সে কথাই এবার বলছি।

❑ শিবাম্বুর নবমূল্যায়ন ❑

শিবাম্বুর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, শিবাম্বুর মাধ্যমে দেহের যতটা দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের হয়ে যায় তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় উপাদান বহির্গত হয়। তার মধ্যে ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, ক্লোরাইড, সোডিয়াম, ইউরিয়া (নাইট্রোজেন), ইন্‌অর্গানিক সাল্‌ফেট প্রধান। তা ছাড়া, ভিটামিন, নানা ধরণের হর্মোন, শুক্র (বীর্য) ইত্যাদির মত প্রাণদায়ী পদার্থও বের হয়ে যায়। সুতরাং এগুলি চলে যাবার জন্য যে অভাব ঘটে দেহকে তা পুনরায় খাদ্য ও অন্যান্য জৈবিক প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু শিবাম্বু পান করে যদি আমরা তা দেহে প্রবেশ করিয়ে দিই তবে তৈরী করা জিনিষ পেয়ে দেহ সহজেই তা গ্রহণ করতে পারে এবং দৈনন্দিন খাদ্য থেকে যা আহরণ করবে

তা হবে অতিরিক্ত। তা সঞ্চিত থাকবে। কিন্তু তা না হলে দেহকে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুধু ক্ষতি পূরণ করতেই ব্যস্ত থাকতে হবে—সঞ্চয়ের কথা হবে সুদূরপরাহত, ফলে দেহের ক্ষয়ের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে রোগের প্রাদুর্ভাবও বৃদ্ধি পাবে। এ ভাবেই অকাল বার্ধক্যকে আমরা আমন্ত্রণ করে আনি। এ ভাবেই চল্লিশ পার না হতেই উচ্চ রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ, হৃদরোগ, বহুমূত্র, ফুসফুস ও প্রস্রাবের কঠিন রোগ, প্রষ্ট্রেট গ্রন্থির বৃদ্ধি ও বাতের মত অসাধ্য রোগের শিকার হতে হয়। কিন্তু যারা ঠিক সময়ে শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করেন তারা কোন অবস্থাতেই এসব রোগের কবলে পড়েন না। সুস্বাস্থ্য নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জীবনকে ভোগ করতে পারেন। তাদের মৃত্যু অনেকটা ইচ্ছা মৃত্যুর মত রোগ-যন্ত্রণা রহিত।

অবশ্য আমাদের বক্তব্যকে অনেকে প্রচারকের অতিশয়-উক্তি মনে করবেন। কিন্তু একটা কথা মনে করলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবেন। প্রত্যেক প্রচারেই প্রচারকের কিছু লাভের প্রত্যাশা থাকে — তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বহুল বিক্রয়। কিন্তু আমাদের প্রচারিত দ্রব্যটি মোটেই আমাদের উৎপাদিত পদার্থ নয়। এটা প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পদ। আমরা শুধু সেই সম্পদকে চিনিয়ে দিচ্ছি অমূল্য স্বাস্থ্য সম্পদ রক্ষার জন্য—অযথা অর্থক্ষয় থেকে রক্ষা পেতে। সুতরাং এই প্রচারের পিছনে স্বার্থের সন্ধান বৃথা। তবে হ্যাঁ, এতে কারো কারো স্বার্থহানি হবে। মানুষ যদি রোগে না ভোগে তবে চিকিৎসক ও ঔষধ প্রস্তুতকারকদের অবস্থা কি হবে? তখন তারা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সাধারণ মানুষও সুস্বাস্থ্য নিয়ে তাদের কাজ সর্বশক্তি দিয়ে আরো ভালোভাবে করতে পারবেন। তার ফলে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

এসব শুনেও মনের সন্দেহ যেতে চায় না। কারণ এখনও এলোপ্যাথিক বিশেষজ্ঞের অভিমত শোনানো গেল না, তাই এসব কথাকে প্রচারকের অতিশয়োক্তি ব'লে মনে হচ্ছে। তাই এবার শুনুন, স্বমূত্র সম্পর্কে আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসপাতালের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞের অভিমত। তিনি M.D., M.S. মূত্র বিশেষজ্ঞ (Nephrologist)। তাঁর অভিমতটি (report) অনেক বড়। তাই বিশেষ দরকারী অংশ তুলে ধরছি।

তাঁর বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে—

১) একজন সুস্থ ব্যক্তির প্রস্রাব জীবাণুমুক্ত এবং তাতে রয়েছে জীবাণু ধ্বংসকারী শক্তি। যদি গবেষণার দ্বারা এই বিশেষ শক্তিটি আলাদা করা যায় তবে ভবিষ্যতে অনেক দুরারোগ্য রোগ অনায়াসে সারিয়ে ফেলা যাবে। যখন মূত্রযন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তখনই মূত্রে রোগজীবাণুর আবির্ভাব সম্ভব হয়। এই কারণেই স্বমূত্রপানে অভ্যস্ত হলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারবে না এবং রোগের আক্রমণও হবে না।

২) মূত্রে কিছু পরিমাণে শুক্র (পুরুষের ক্ষেত্রে) এবং রেত (মেয়েদের ক্ষেত্রে) থাকে। আমাদের জীবনীশক্তি বর্ধনে তার বিশেষ প্রয়োজন। স্বমূত্রপানে তাই সঞ্জীবনীসুধার কাজ হয়। বার্ধক্য দূরে সরে যায়। এসব ছাড়াও কিছু যৌন উত্তেজক রস (Sex Hormone) মূত্রে থাকায় দেহের বৃদ্ধি ও উৎসাহ (energy) বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৩) মানব মূত্রের মাধ্যমে বেশ কিছু জৈব লবণ জাতীয় পদার্থ (যেমন — ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফেট, ম্যাগনেসিয়াম) বের হওয়া সত্ত্বেও মূত্রযন্ত্রে পাথরের সৃষ্টি হয় না। কারণ মূত্রে এমন কিছু অজ্ঞাত পদার্থ রয়েছে যা এই পদার্থ সৃষ্টিতে বাধা দেয়। বৃক্কের (Kidney) স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট হলেই সেই 'কিছুর' অভাবে 'মূত্র-পাথুরি' তৈরী হয়। সুতরাং যারা যথারীতি শিবাম্বু পান করেন তারা এই উপদ্রব থেকে চিরমুক্ত থাকতে পারবেন।

৪) নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত শরীর তত্ত্ববিদ্ এলবার্ট জেন্ট গাইওর্গী (Albert Szent Gyorgi) মানবমূত্রে এমন একটি পদার্থ আবিষ্কার করেছেন যা পরীক্ষাগারে ক্যান্সারকোষকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই তিনি আশা করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মূত্র থেকেই ক্যান্সার নিরাময়ের ঔষধ আবিষ্কার সম্ভব হবে। তা ছাড়া, ফেডারেশন অব আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বাইওলজি-র এপ্রিল ১৯৬৬-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, পরীক্ষাগারে গবেষণার সময়ে মানবমূত্রে একটি অদ্ভুত পদার্থ পাওয়া যায় যা ক্যান্সারকোষে দিলে তা ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে নষ্ট হয়।

৫) মূত্রে এরিথ্রোপ্রোটিন নামক এক প্রকার হর্মোন পাওয়া যায় যা অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে। এই কারণে বৃক্ক (kidney) পীড়িত

হলে মানুষ অত্যধিক রক্তাল্পতায় আক্রান্ত হয়। তাই নিয়মিত শিবাম্বুপানে রক্তাল্পতা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৬) ভিটামিন 'ডি'-কে সক্রিয় করার জন্য বৃক্কের সক্রিয়তা প্রয়োজন। তাই ঐ দেহযন্ত্রটি খারাপ হলে দেহে ঐ ভিটামিনের অভাব হয় এবং বাহ্যিক উপায়ে তা গ্রহণ করলেও শরীর তা ধারণ করতে পারে না। শিবাম্বুপানে ঐ বিপর্যয় রোধ করা যায়।

৭) মূত্র পাকযন্ত্রে প্রবেশ করে সমস্ত পাচক গ্রন্থিগুলিকে সক্রিয় করে। সেই জন্যই শিবাম্বুপানের পর কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়ে অতিমাত্রায় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

৮) জন্মনিয়ন্ত্রণে স্বমূত্র পান অত্যন্ত সহায়ক। সহবাসের পরেই স্বমূত্র পান করলে গর্ভের আশঙ্কা থাকে না। আমরা পরবর্তী বিশেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

৯) মূত্রে "ইউরোকাইনেজ" (Urokinese) নামে একটি পদার্থ আছে যা জমাট রক্তকে তরল করে দেয়। তাই থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত রোগীকে স্বমূত্র পান করালে সে সত্ত্বর রোগমুক্ত হতে পারবে। তা ছাড়া, সুস্থ মানব-মূত্রে "নাইট্রো গ্লিসারিন" (Nitro Glycerine) নামে একটি শক্তিশালী পদার্থ থাকে যা ধমনীর প্রসারণে সাহায্য করে (a powerful artery dilating agent)। তাই যারা সাময়িক ধমনী সঙ্কোচন যন্ত্রণায় (Angina Pectoris) আক্রান্ত হন তারা স্বমূত্রপানে চিরদিনের জন্য এই রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

এতসব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকদের কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য হবে। একথা জেনেও এত কথা লেখার কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুব সুখবোধ্য না হলেও তারা বুঝতে পারবেন যে, এই চিকিৎসাবিধি অন্ধসংস্কারপ্রসূত নয়। তাই ব্যাখ্যা তাদের পক্ষে সহজভাবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণে প্রস্তুতি এনে দেবে। বিষপানের আতঙ্ক মন থেকে যাবে।

আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আরো সুদূরপ্রসারী। আমরা উপরি-উক্ত ব্যাখ্যার আবেদন সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি সম্পন্ন প্রথিত যশা চিকিৎসক ও গবেষকমণ্ডলীর কাছে, — তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা এগিয়ে এসে এই বিষয়ে গবেষণা করে সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করে মানবজাতির কষ্ট লাঘবে সাহায্য করুন। মর্ত্যে অমৃতলোক সৃষ্টির সহায়ক হউন। তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এবার শিবাম্বুর প্রকৃতিগত গুণ অন্যভাবে আলোচনা করব। মানব মূত্রের মধ্যে ৯৫ শতাংশ জল, ২.৫ শতাংশ ইউরিয়া এবং ২.৫ শতাংশ খনিজ পদার্থ, লবণ, হর্মোন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে। এই ২.৫ শতাংশ ''ইউরিয়া'' থাকার জন্য শিবাম্বুকে ইউরিণ বলে। আমরা জানি যে ''ইউরিয়া'' আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে এই ইউরিয়া শরীরে শিবাম্বু পানের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? কারণ শিবাম্বু পানের সময় ''ইউরিয়াকে'' বাদ দিয়ে শিবাম্বু পান সম্ভব নয়। অথচ আমরা জানি শিবাম্বু পানে ইউরিয়া আমাদের ক্ষতি করে না। তাই এ বিষয় নিয়ে নানা দেশে বিজ্ঞাণীগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে শিবাম্বু পানে ইউরিয়া দেহের কোন ক্ষতি করে না। বরং উপকার করে। তাই এ বিষয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে তার মূল কথা এখানে সংক্ষেপে দিয়ে দিচ্ছি।

শিবাম্বুর ভিতরে যে সব হর্মোন, প্রোটিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে তা দেহের পুষ্টির কাজে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু প্রশ্ন উঠেছে ইউরিয়া (Urea), অ্যামোনিয়া নিয়ে। কারণ এ সব জিনিষ বিষাক্ত। তাই শিবাম্বুর মাধ্যমে শরীরে গেলে শরীরের উপকারের পরিবর্তে অনিষ্ট করবে। এই নিয়ম সত্য হলে শিবাম্বু উপবাসের সময় বার বার শিবাম্বু পান করায় প্রস্রাব তত ঘন ও তেতো হয়ে রোগীকে আরও বেশী আচ্ছন্ন করে করে শেষে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ঠিক বিপরীত। বার বার শিবাম্বু পান করায় তার বর্ণ ও স্বাদ প্রায় স্বাভাবিক পরিশ্রুত জলের মত হয়ে যায়। তাই বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে শিবাম্বু পানের পর পাকস্থলীর হিতকারী জীবানু পাকস্থলীর ইউরিয়াকে ''গ্লুটামিনে'' পরিবর্তিত করে। এই পরিবর্তিত পদার্থটি দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যে অংশ অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয় তা জীবানু ধ্বংসকারী শক্তিতে পরিণত হয়ে দেহকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

তাই এখন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে শিবাম্বু পানের পর পাকযন্ত্রে শিবাম্বু নানা প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে দেহের পুষ্টি ও রোগ নিরাময়ে সক্রিয়

অংশ নেয়। এই রূপান্তরিত গ্লুটামিন (glutamin) মস্তিষ্ক, পাকযন্ত্র ও মাংস পেশীর পুষ্টিদায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে নানা দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই তথ্য প্রমাণিত হওয়ায় শিবাম্বু তত্ত্ব শুধু অন্ধ সংস্কার নয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত তথ্য। অধিকন্তু গ্লুটামিন প্রতিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং রোগ নিরাময় ত্বরান্বিত করে।

যেহেতু ইউরিয়া স্নায়ুকেন্দ্রকে চাপ মুক্ত করে সেই জন্য নিয়মিত শিবাম্বু পানে সহজেই মনকে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে সাহায্য করে। বর্তমান সমাজে দুশ্চিন্তাই (tension) প্রধান ব্যাধি। মানুষ কখনও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারে না। তাই অনিদ্রায় ভোগে। তাই এই রোগের হাত হতে মুক্তি পেতে "ঘুমের ওষুধ" প্রত্যহ খেতে হয়, কিন্তু শিবাম্বু পান করলে মস্তিষ্কের চাপ হ্রাস হয়। শিবাম্বু মনকে দুশ্চিন্তার হাত হতে মুক্ত করতে সাহায্য করে।

সবচেয়ে ইউরিয়ার উল্লেখযোগ্য অবদান ক্যান্সার চিকিৎসায়। ক্যান্সার চিকিৎসার সব চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে সুস্থ কোষের সঙ্গে ক্যান্সারের কোষ এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে যে তাকে আলাদা বিচ্ছিন্ন করে নষ্ট করে দেওয়া যায় না কিন্তু শিবাম্বু প্রয়োগে ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ সুস্থ কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বলে তাকে শিবাম্বুই নষ্ট করে দেহকে এই দূরারোগ্য রোগের হাত থেকে মুক্ত করে। শিবাম্বুর এই বিশেষ পদার্থকে "ডাইরেক্টিভ" বলে। পরীক্ষাগারে এই দ্রব্যের আবিষ্কার হয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে একে দিয়েই এই দুরারোগ্য রোগ মনুষ্যসমাজ থেকে নির্মূল করা যাবে। তাই এখন শিবাম্বু চিকিৎসা পদ্ধতিকে আর অন্ধ কুসংস্কার বলা যাবে না। ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে মুক্তির পথ দেখাবে এই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের এগুতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রস্তুতি

শিবাম্বু চামৃতং দিব্যং জরা রোগ বিনাশনম্।
তদাদায় মহাযোগী কুর্যাদ্‌বৈ নিজ সাধনম্।।

ডামরতন্ত্র । ৯।

জরা ও রোগের বিনাশক এই শিবাম্বু দিব্য অমৃত স্বরূপ। কিন্তু মহাদেব কথিত ডামরতন্ত্রের এই অমৃতবাণী কি আমরা সহজে মেনে নিতে পারি? বর্তমান চিকিৎসা-বিধির নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় হতাশ ও আতঙ্কিত হয়েই মানব সমাজের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরিত্রাণের উৎকৃষ্ট পথ শিবাম্বুকল্প একথা ধীরে ধীরে সকলের মনে একটা বিশ্বাস উৎপন্ন করতে পেরেছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধ প্রচারণা সরল বিশ্বাসীদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করার পূর্বে নিজের একটা দৃঢ় মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন। মনে ভয় বা সংশয় নিয়ে অপরের কথায় এই চিকিৎসা-বিধি গ্রহণ করলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, যিনি সেই ভাবনা নিয়ে ঔষধ গ্রহণ করেন তার ফলও তদনুরূপ হয়। যদি মনে ভয় থাকে যে, শিবাম্বুর মধ্যে ভয়ঙ্কর সব রোগের বীজাণু আছে এবং তা গ্রহণ করলে দেহে ভয়ানক রকমের রোগের আবির্ভাব হবে তবে ঐ মানসিক ধারণার জন্যই শিবাম্বু গ্রহণে দেহের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এই মানসিক আতঙ্ক থেকেই দেহ পীড়িত হ'য়ে পড়বে। একটা কথা আছে যে, বনের বাঘের চেয়ে মনের বাঘের ভয়ে লোক বেশী মরে। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই মহাশয় এক পত্রে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন —If one takes it with faith nothing will matter to him. If one has no faith in it, will not be useful

to him as such. অর্থাৎ বিশ্বাস নিয়ে এই বিধি গ্রহণ করলে কোন কিছুই পথের বাধা হবে না। কিন্তু যার এ বিষয়ে বিশ্বাস নেই তার পক্ষে এর কোন প্রয়োজন নেই।

একটু ভেবে দেখলেই বুঝবেন যে, মানবমুত্র যদি সত্যিই বিষাক্ত হ'ত তবে মূত্র থলিতে ঐ বিষ থাকা অবস্থাতেই মানব দেহে বিষক্রিয়া কর'ত এবং তাতেই মানুষের মৃত্যু হ'ত। প্রকৃত পক্ষে কোন সুস্থ ব্যক্তির মূত্রেই কোন ক্ষতিকর বিষ থাকে না। তবে অসুস্থ অবস্থায় কিছু রোগের জীবাণু প্রস্রাবে দেখা দেয়। ঐ সব ক্ষেত্রে ঐ জীবাণু পুনরায় দেহে প্রবেশ করে (শিবাম্বু পান মাধ্যমে) ঐ রোগের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধক শক্তি (antibody) সৃষ্টি করে। অনেকটা রোগ প্রতিরোধী টিকার মত। বিশেষ করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নরমূত্রকে "রসায়ণ" রূপে বর্ণনা করেছে।

নর মূত্রং গরং হন্তি সেবিতন্তদ্রসায়নম্
রক্ত পামাহরং তীক্ষ্ণং সাক্ষার লবণং স্মৃতম্।।

(আয়ুর্বেদ—ভাবপ্রকাশ)

অধিকন্তু দেহের অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি ঐ মূত্র থেকে আমরা পেতে পারি। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে মূত্রে অনেক দরকারী "উত্তেজক রস" (Hormone) পাওয়া যায় যা দেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও হিতকর। তাই এই চিকিৎসা-বিধি গ্রহণ করার পূর্বে মনকে সংস্কারমুক্ত ক'রে মানসিক দিক থেকে নিঃসংশয় হতে হবে। তবেই অভীষ্ট লাভ হবে।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রবর্তিত এই অমূল্য সম্পদকে বিস্মৃতির অতল তল থেকে উদ্ধার করে আর্তজনের হাতে তুলে দিয়ে রোগমুক্ত জীবন উপভোগ করার পথ প্রদর্শন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অনিবার্য বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আবিষ্কর্তাগণই বিশেষ দুশ্চিন্তা গ্রস্ত, তাদের হাতে আর অন্য কোন অস্ত্র না থাকায় রোগীর জীবন রক্ষার্থে শেষ অস্ত্র হিসাবে ঐ সব বিষাক্ত ঔষধ নিরূপায় হয়ে প্রয়োগ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু আবিষ্কর্তার সতর্কবাণী উপেক্ষা করেই ব্যবহারকারী চিকিৎসকগণ ঐগুলি নির্বিচারে প্রয়োগ করে রোগীর দেহে নূতন নূতন রোগের

সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যই আমরা এই অভিনব উদ্ধারের পথ আর্ত মানব গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিচ্ছি; সংস্কারমুক্ত হয়ে গ্রহণ করলে ব্যবহারকারী জীবনে নূতন আলোর সন্ধান পাবেন।

আমরা শুধু বই পড়েই বা শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই এই অভিনব চিকিৎসা-বিধি প্রচার করছি না। অসংখ্য ক্ষেত্রে নিজেরা প্রয়োগ করে এবং অন্যের অভিজ্ঞতার সংবাদ পেয়ে এর অব্যর্থতায় নিঃসংশয় হয়েই এই চিকিৎসা-বিধি প্রচারে হাত দিয়েছি। নিজেরা কারোর পরামর্শ ছাড়াই প্রয়োজন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এর অব্যর্থতায় মুগ্ধ হবেন। চিকিৎসায় অভীষ্ট ফল পাবেন। পৃথিবীর নানা দেশে হাজার হাজার ক্ষেত্রে এই বিধি ফলপ্রসূ হয়েছে বলেই জোর করে বলতে পারছি যে, আপনার ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ হবে অভ্রান্ত ও অব্যর্থ। শুধু আপনার দিক থেকে নিতে হবে ধৈর্য্য ও মানসিক প্রস্তুতি। তবেই সাফল্য হবে করায়ত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়

শিবাম্বুকল্প ও প্রয়োগ বিধি

শিবাম্বু স্বমূত্রের তান্ত্রিক নাম। অতি প্রাচীন কাল থেকেই রোগ আরোগ্য শিবাম্বুর প্রয়োগ বহুদেশে প্রচলিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষ ছাড়াও প্রাচীন গ্রীস ও মিশর দেশে ঔষধ হিসাবে এই প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে আউল, বাউল ও নাথ সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে গুরু পরম্পরায় এর প্রচলন গুপ্ত ভাবে বর্তমান কাল পর্যন্ত হয়ে আসছে। যাযাবর জীপ্‌সী ও বেদেদের মধ্যে এই কল্পের প্রচলন খুব বেশী। তবে অন্য কোথাও আমাদের দেশের মত এই পদ্ধতিতে একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নীত করতে পারেনি। প্রায় ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিকে একটি টোট্‌কা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ইতর প্রাণীদের মধ্যে স্বমূত্র ব্যবহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। যদি কারোর বাড়ী খরগোস থাকে তবে দেখতে পাবেন যে, তারা অসুস্থ হলে সমস্ত খাদ্য ত্যাগ করে শুধু মাত্র তাদের প্রস্রাব পান করে দু-একদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণে সমর্থ হয়ে ওঠে। ঐ সময় নিজেদের প্রস্রাবে শুয়ে থেকে সমস্ত শরীর ভিজিয়ে রাখে। তাতেই তাদের রোগ আরোগ্য খুব তাড়াতাড়ি হয়। এজন্যই ভগবান ইতর প্রাণীদের দেহের গঠন এমন ভাবে করেছেন যেন তারা সহজেই মূত্রদ্বার থেকে স্বমূত্র পান করতে পারে।

এই রোগারোগ্য বিধান ডামরতন্ত্র ও ভাবপ্রকাশ প্রমুখ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শুধু এই প্রকল্পের বিধিই সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

শিবাম্বুকল্পের চিকিৎসার চারটি স্তর আছে —

১) শিবাম্বু পান। ৩) শিবাম্বু উপবাস।

২) শিবাম্বু মালিশ। ৪) শিবাম্বু পট্টি বা পুলটিশ।

● **শিবাম্বু পান** — শিবাম্বু-বিধির প্রথম অঙ্গ শিবাম্বু পান। দেহকে সুস্থ রাখতে হলে অথবা রুগ্ন দেহকে সুস্থ করতে হলে প্রত্যেক দিন ভোরে শিবাম্বু পান অবশ্য কর্তব্য। খুব ভোরে উঠে একটি কাচের গ্লাসে নিজের মূত্রের প্রথম ও শেষ অংশ বাদ দিয়ে মধ্য অংশ ধরে রেখে টাট্‌কা অবস্থায় পান করতে হবে। প্রথমে ১ কাপের মত পান করে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে পুরো এক গ্লাস করে পান করতে হবে। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে প্রথম বারের শিবাম্বু পান নাক দিয়েই করা সঙ্গত। তাতে নাকের গহ্বরে সঞ্চিত সমস্ত রোগ বীজানু (bacteria and virus) ধ্বংস হয়ে রোগ আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়। নাক দিয়ে পান করা মোটেই অসুবিধাজনক নয়। নিয়মটি এই রকম —

দু'নাকের মধ্যে বন্ধ নাকটি টিপে ধরে খোলা নাকটি শিবাম্বু পাত্রে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে ঘুমের ভিতর নাক ডাকার মত করে গলা দিয়ে বায়ু আর্কষণ করলে দেখবেন পাত্রের শিবাম্বু অতি সহজে গলায় চলে এসেছে। এতে নাক জ্বালা বা হাঁচি কিছুই হবে না। অভ্যস্ত হলে ২/৩ গ্লাসও এক সঙ্গে পান করতে কোন কষ্ট হবে না।

শিবাম্বুর কাজ হলো দেহ-যন্ত্রের সমস্ত বাধা (Congestion) দূর করা এবং দেহের সমস্ত দূষিত মল বের করে দেওয়া। তাই শিবাম্বু পানের কিছুদিনের মধ্যেই দাস্ত, বমি, প্রচণ্ড সর্দি, কাশি ও গায়ে একপ্রকার উদ্ভেদ দেখা দিতে পারে। এই সব উপসর্গ রোগ আরোগ্যের প্রাথমিক লক্ষণ। কারণ দেখা যাবে যে, এই সব উপসর্গ সত্ত্বেও শরীর দুর্বল না হয়ে ক্রমেই সবল হয়ে উঠবে। প্রচণ্ড ক্ষিধে ও ঘুম গভীর হবে। শরীরের বিষাক্ত বিষ বেড়িয়ে যাওয়ার জন্যই দেহের এই সাবলীলতা। ক্রমে দেহ দোষমুক্ত হলে ঐ সব বিরূপ প্রতিক্রিয়া আপনা থেকেই চলে যাবে।

এই সময় শরীর গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। তাই ঐ ক্ষুধার সময় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য না খেলে নানারূপ ক্ষতিকর উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন— পেট ফাঁপা, অক্ষুধা, অনিদ্রা, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস ইত্যাদি। তাই ঐ সময় খাদ্যের পরিমাণগত দিকটা না দেখে গুণগত দিকটা দেখতে হবে। খাদ্যের মধ্যে দুধ তখন সবচেয়ে বেশী দরকারী। একজনকে অন্ততঃ দু'বেলায় এক লিটার দুধ খেতে হবে। আর তা না হলে ভাতের সঙ্গে বিশুদ্ধ ঘি খেতে হবে।

তার সঙ্গে প্রত্যহ সকালে ১০/১২ টি ছোলা (আগের দিনে ভেজান) বা বাদাম ভাল করে বেটে আখি গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে ১ গ্লাস সরবৎ করে খেতে হবে। তা হলেই ঐ সব প্রতিক্রিয়া চলে যাবে। শরীরও দিন দিন সুস্থ ও পুষ্ট হতে থাকবে। যদি পেটে বেশী বায়ু জমে তবে কিছুদিন শিবাম্বু পান বন্ধ রেখে শুধু শিবাম্বু মালিশ করতে হবে। প্রতিক্রিয়া কমে গেলে আবার শিবাম্বু পান আরম্ভ করতে হবে।

তবে যাদের যকৃতের (Liver) কোন গুরুতর রোগ হয়ে থাকে তাদের পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্য (Fatty Food) গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। তারা শিবাম্বুর পরিমাণ কমিয়ে সুমিষ্ট ফল দ্বারা দেহের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবেন।

● **শিবাম্বু মালিশ** — শোবার সময় বেশী জল পান করলে পরের দিন ভোরে বেশী প্রস্রাব হবে। পানের উপযুক্ত পরিমাণ শিবাম্বু রেখে বাকীটা একটা শিশিতে মালিশের জন্য রেখে দিতে হবে। এরূপ ৪ টি শিশিতে ১, ২, ৩, ৪ নম্বর লিখে রাখবেন। প্রথম শিশির শিবাম্বু ৪ দিনের বাসি হলে মালিশ করার জন্য ব্যবহার করবেন। এভাবে প্রতিদিনই একটি একটি করে শিশি ভর্তি করে রাখলে প্রত্যেক দিনই ৪ দিনের বেশী বাসি শিবাম্বু মালিশের জন্য পাওয়া যাবে।

মালিশের সময় প্রথমে মাথায় মেখে পরে মুখে ও ঘাড়ে মাখতে হবে, তার পরে বুকে, দু'হাতে, পেটে, হাঁটুতে ও পায়ে মালিশ করতে হবে। পায়ের তলায় অন্ততঃ ৫ মিনিট করে মালিশ করবেন। আর অসুস্থ হলে ১০ মিনিট। সর্বদা পায়ে ও হাঁটুতে বেশীক্ষণ মাখা দরকার। মালিশ করার সময় হাতের গতি হবে হৃৎপিণ্ডের দিকে। অবশ্য মালিশের সময় প্রথম দিকটায় তেল মালিশ করার মত মেখে পরে জল শুকিয়ে গেলে হাতের গতি বুকের দিকটায় আনতে হবে। যেমন হাতের মালিশের সময় চামড়ার উপর দিয়ে হাতের গতি হবে আঙুল থেকে কাঁধের দিকে ও পা থেকে কোমরের দিকে। এতে শিরার উপর চাপ পড়ে রক্তের গতি হৃৎপিণ্ডের দিকে সহজ করে দেয়।

সাধারণতঃ বাসি শিবাম্বুতে এ্যামোনিয়া উৎপন্ন হওয়ায় একটা উৎকট গন্ধ হয়। এ্যামোনিয়া হওয়ায় বাসি শিবাম্বু লোমকূপ দিয়ে সহজেই শরীরের ভিতর গিয়ে রোগারোগ্যে সাহায্য করে। কিন্তু উৎকট গন্ধ গা থেকে সহজে যেতে চায়

না বলে অনেকে শিবাম্বু পানে উদ্বুদ্ধ হলেও মালিশে রাজী হন না। এজন্য ঐ গন্ধ নষ্ট এবং বাসি শিবাম্বুর গুণগত উৎকর্ষ বিধান করার জন্য ১০০ মি. লি. শিবাম্বুর সঙ্গে ৬ থেকে ১০ টি শুকনো আমলকির টুকরো মিশিয়ে ৪ দিনের বাসি করতে হবে। এতে উগ্র গন্ধ নষ্ট হবে এবং ভিটামিন সি (Vitamin C) সমৃদ্ধ হয়ে চামড়া ও চুলের অনেক বেশী উপকার করবে।

● **শিবাম্বু উপবাস** — ডামরতন্ত্রে শুধু শিবাম্বু পান ও মালিশের কথাই বলা আছে। কিন্তু মিঃ আর্মষ্ট্রং ও শিবাম্বু বিশেষজ্ঞগণ পুরাতন কঠিন রোগ চিকিৎসায় শিবাম্বু উপবাসের বিধান দিয়েছেন। সাধারণতঃ কঠিন রোগ প্রথমেই পাকযন্ত্রকে (Digestic System) নষ্ট করে দেয়। সেই জন্য হজমের গোলযোগে পুষ্টি আহরণ ব্যাহত হয়ে দেহ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা হারিয়ে দিন দিন রোগের আক্রমণে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এই কারণে কিছুদিন পাকযন্ত্রকে বিশ্রাম দিয়ে শিবাম্বুর সহজ গ্রাহ্য পুষ্টি আহরণ করে অনেক কম সময়ে দুর্বল দেহ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ক্ষমতা আয়ত্ত করে রোগ নির্মূল করে সুস্থ হতে পারে। **তবে শরীর খুব ক্ষীণ হলে বা নিম্ন রক্তচাপ থাকলে শিবাম্বু উপবাস উচিত নয়। তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।**

যদি শরীর খুব ভেঙ্গে না গিয়ে থাকে তবে চিকিৎসা আরম্ভ করার প্রথমেই কিছুদিন উপবাস করা কর্তব্য। এই উপবাসের সময় দিনে রাতে ২৪ ঘন্টায় যতবার প্রস্রাব হবে তার প্রতি ফোঁটা পান করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে ঠাণ্ডা জল পান করা যেতে পারে। যেহেতু শিবাম্বু পানের আধ ঘন্টার মধ্যেই ঐ শিবাম্বু আবার বেরিয়ে আসে সে জন্য রাত্রিতে শোবার সময় আগের বারের প্রস্রাব না পান করেই শুয়ে পড়তে হবে। তা না হলে বার বার ঘুম ভাঙ্গার জন্য শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। শরীরে তখন রোগের গ্লানি থাকবে না। ক্ষুধা ও ঘুম যখন স্বাভাবিক হবে তখনই উপবাস ভঙ্গ করতে হবে। তবে শিবাম্বু উপবাস ভঙ্গে একটা বিশেষ নিয়ম আছে। তা মেনে না চললে অনিষ্ট হবে। সে নিয়ম এরূপ—

সাধারণতঃ যতদিন শিবাম্বু উপবাস করা হয়, স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরে আসতে ততদিন সময় নেওয়া দরকার। তবে অনেক বেশী উপবাস হলে (যেমন ৩০ থেকে ৬০ দিন) ১০ দিনেই স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরে আসা যেতে পারে।

শিবাম্বু উপবাস ভঙ্গের প্রথম দিন শুধু ফলের রস ও জল পান করে থাকতে হবে। এই রস প্রথমে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত কয়েক মিনিট অন্তর ৬ চামচ করে পান করতে পারা যাবে। তবে সারা দিনে ৫-৬ গ্লাস ফলের রস ও ৪ গ্লাস জলের বেশী যেন পান করা না হয়। পরের দিন ২ ঘন্টা অন্তর ১ গ্লাস ফলের রস ও জল পর্যায় ক্রমে পান করতে হবে। তৃতীয় দিন ফলের রসের সঙ্গে লবণশূন্য ডালের ও সব্জীর ঝোল দুই বেলা খেতে পারা যাবে। চতুর্থ দিন খুব হাল্‌কা করে ডাল, সব্জী মিশিয়ে লবণশূন্য খিচুরী খেতে হবে। এটা সহ্য হলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরে আসবেন। দেখবেন, এভাবে চললে অল্প দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। ক্যান্সার, বহুমূত্র, হাঁপানী, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণের প্রতিক্রিয়া বুঝে স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরে আসবেন।

শিবাম্বু পানের পর যারা প্রথম কিছুটা উপকার পেয়ে পরে নূতন উপসর্গের শিকার হয়ে পড়েন তারা উক্ত উপবাস ভঙ্গের নিয়মে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করলে ঐ সব উপসর্গের হাত থেকে সহজেই অব্যাহতি পাবেন। পরে সহজ পাচ্য খাদ্য খেলে সুস্থতা সহজেই ফিরে আসবে।

অতি দুর্বল রোগীর ক্ষেত্রে রোগ যত জটিল হউক না কেন প্রথমেই উপবাস দেওয়া ঠিক হবে না। অনেক সময় দুর্বল শরীরে উপবাসের প্রতিক্রিয়া সহ্য না হয়ে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে।

● **অর্ধশিবাম্বু উপবাস** — অনেক সময় দুর্বল শরীরে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেও রোগীর পক্ষে পূর্ণ উপবাস সম্ভব হয় না। রোগী আরো দুর্বল হয়ে বেশী অসুস্থ বোধ করে। অথচ তাদের পরিপাক যন্ত্রের কিছুটা বিশ্রাম অতি প্রয়োজন। সে সব ক্ষেত্রে পূর্ণ উপবাস না করে অর্ধ উপবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করে ভাল ফল পেয়েছি।

অর্ধ উপবাসকারী ঘুম থেকে উঠে বেলা ১০ টা পর্যন্ত প্রতিবারের শিবাম্বু যথারীতি পান করবেন। তারপর আর শিবাম্বু পান না করে বেলা ১২ টা থেকে ১ টার মধ্যে লঘু অথচ পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করবেন। তারপর আর কোন আহার্য গ্রহণ না করে বেলা ৪ টা থেকে ঘুমের পূর্বে শেষ বারের শিবাম্বু বাদ দিয়ে প্রতিবারের শিবাম্বু পান করে যাবেন। তাতে উপবাস দীর্ঘদিন

করা যাবে অথচ শরীরও খুব দুর্বল হবে না। তবে এতে উপকার পেতে একটু সময় বেশী লাগবে। তাতে সেই ফল অবশ্যই পাবেন। এসব ক্ষেত্রে শিবাম্বু উপবাসের কঠোর বিধিনিষেধ পালন করার প্রয়োজন হবে না। উপবাস ভঙ্গও সহজ ভাবেই করতে পারা যাবে। সকলের পক্ষেই এই ব্যবস্থা সহজ সাধ্য। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই মাসে অন্ততঃ ২ দিন উপবাস করা কর্তব্য। তা হলে দেহ কখনই রোগাক্রান্ত হবে না।

● **শিবাম্বু পুলটিস (Urine Pad)**– পিত্ত পাথুরী, মূত্রথলির পাথুরী, বেদনাদায়ক ফোড়া, ক্যান্সারের ক্ষত, গলিত কুষ্ঠ, কারবাঙ্কল, পচনশীল ক্ষত (Gangrene), একজিমা (Eczema) প্রভৃতি রোগে মালিশের সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে বাসি শিবাম্বুর পুলটিস অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন। পরিষ্কার ন্যাকড়া চার ভাঁজ করে বাসি শিবাম্বুতে ভিজিয়ে নিতে হবে। তারপর ক্ষত স্থানে লাগিয়ে ভাল করে বেঁধে দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে বার বার বাসি শিবাম্বু দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। অন্ততঃ কিছুদিন এরূপ করলে ঐ সব রোগের ক্ষত অতি সহজেই সেরে যায়। কুষ্ঠ ব্যাধিতে ও অন্যসব দুষিত ক্ষতে এই পুলটিস বিশেষ দরকার। তা হলে ক্ষত অতি সত্ত্বর শুকিয়ে যায়। তবে সেই সঙ্গে শিবাম্বু পান ও দেহের অন্যত্র শিবাম্বু মালিশ অতি অবশ্যই প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

রোগ প্রতিরোধ প্রয়োগ বিধি

যারা সুস্থ বা দৃশ্যত যাদের মধ্যে কোন রোগ নেই তাদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখতে শিবাম্বু বিধি গ্রহণ অনেক সহজ। তারা যদি কোথাও কাজ করেন তবে তাদের প্রথম কয়দিন ভোরের শিবাম্বুর সঙ্গে সকালে প্রধান খাদ্যের ১ ঘন্টা পূর্বে একবার শিবাম্বু পান করা উচিত। ঐ সময় কিছুদিন প্রাতরাশ বন্ধ রাখবেন। তাতে শরীরের কোনই ক্ষতি হবে না। প্রথমবার সকাল ৬ টায় ও দ্বিতীয় বার সাড়ে সাতটায় পান করলেই চলবে। বিকেলে কার্যক্ষেত্র থেকে ফিরে আর একবার পান করবেন। এভাবে দিনে ৩ বার পান করলে কয়েক দিনের মধ্যেই দাস্ত, সর্দি ও অন্যান্য দৈহিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে শরীর পরিশুদ্ধ হবে। তারপর থেকে শুধু সকাল ছয়টায় একবার করে শিবাম্বু পান করে দৈনন্দিন নিয়মে অন্যান্য আহার করে যেতে পারবেন। মনে রাখবেন শিবাম্বু পানের সঙ্গে মালিশ অবশ্য কর্তব্য। গন্ধ বন্ধ করার উপায় পূর্বেই বলা হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, পানের চেয়ে মালিশ বেশী ফলপ্রদ এবং পান ও মালিশের রোগারোগ্যের ক্ষমতার হার ৪০ঃ৬০। সুতরাং যারা মালিশের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন সংস্কার বশে পান করতে দ্বিধা বোধ করবেন, তারা প্রথমে মালিশ করে সংস্কারের থেকে প্রাথমিক ভাবে মুক্ত হয়ে পরে শিবাম্বু পানে উদ্বুদ্ধ হতে পারবেন।

রোগ প্রতিরোধে শিবাম্বু উপবাস বাধ্যতামূলক নয়, সুতরাং উপবাস না করেই তারা শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করতে পারবেন।

অন্ততঃ প্রথমবারের শিবাম্বু পান নাক দিয়ে করবেন। তার ফলে সর্দি, কাশি, জ্বর ও মাথা ধরা জীবনেও হবে না।

ভোরে মুখ ধোয়ার সময় শিবাম্বু দিয়ে মুখ কুলকুচা করলে পায়োরিয়া দূর হবে। দাঁত কখনও খারাপ হবে না। মুখের যাবতীয় ব্যাধি (যেমন—মুখে

দুর্গন্ধ, দাঁতে ব্যথা, জিহ্বা ও মুখে ঘা, মাড়িতে ঘা প্রভৃতি) দূর হবে।

অনেক সময় জিভে নীল দাগ পড়ে। তা একমাত্র শিবাম্বু পানে দূর হয়। বাসি শিবাম্বু দিয়ে জিভ ঘসলে জিভের সাদা পর্দা দূর হয়।

শিবাম্বু পানে উপকার হয়ে যদি পরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় তবে খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পুষ্টিকর খাদ্য খেলেই ঐসব উপসর্গ দূর হবে। যদি তা না হয় তবে ২ দিন শিবাম্বু উপবাস দিয়ে পরে স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরে এলেই স্বাস্থ্য স্বাভাবিক হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
রোগ নিরাময়ে শিবাম্বু প্রয়োগ

আমরা না চাইলেও রোগ আমাদের চায়—আমাদের দেহ তাদের আকৃষ্ট করে। অবশ্য রোগ সব সময় জোর করে আসতে পারে না। আমরাই স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে রোগকে দেহে আমন্ত্রণ করে আনি। সে যা হোক রোগ হলে প্রতিকার ছাড়া উপায় নেই। শিবাম্বুকল্প সেই প্রতিকারের সহজ পথ। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিবাম্বু-বিধির প্রয়োগ সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হল।

❑ তরুণ রোগে ❑

● **জ্বর, সর্দি, কাশি, পেট খারাপ—**

এ সব তরুণ রোগে প্রথম দিন কিছু না খেয়ে শিবাম্বু উপবাস করলেই রোগ সেরে যাবে এবং জটিল কোনো উপসর্গ আসবে না। যদি ১ দিনে উপসর্গ সব না কমে তবে আরও একদিন উপবাস করতে হবে। তাতে নিশ্চয়ই শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। ঐ সময় কোন পরিশ্রমের কাজ না করে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। পরের দিন ফলের রস, বার্লি, ডাবের জল, সজ্জীর ঝোল খেতে পারা যাবে। তার পরের দিন খুব পাতলা খিচুরী খেয়ে তার পরের দিন থেকেই স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করা যাবে। ঐ সময় আর কোন কষ্ট না থাকলে একবার ক'রে দিনে শিবাম্বু পান করলেই চলবে। তাতেই শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

● **ফোঁড়া ও কাটা ঘা—**

এই সব রোগে আক্রান্ত স্থানের উপর শিবাম্বুর পুলটিস দিতে হবে। পরিষ্কার ন্যাকড়া চার ভাঁজ করে শিবাম্বু দ্বারা ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে আবার ভিজিয়ে রাখবেন। এতেই ক্ষত খুব কম সময়ে সেরে যাবে।

● **দাঁতের ব্যথা—**

এ ক্ষেত্রে টাট্‌কা শিবাম্বু দিয়ে কুলকুচা করলেই ব্যথা কমে যাবে। যদি পোকা দাঁতে ব্যথা হয় তবে প্রথমে কুলকুচা করে পরে সামান্য তুলোয় বাসি শিবাম্বু লাগিয়ে তা পোকা দাঁতের গর্তে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। তাতেই ব্যথা কমে যাবে। পরে ঐ দাঁত তুলে ফেললে অন্য দাঁত নষ্ট হবে না।

● **মাথা ধরা—**

মাথা ধরলে নাক দিয়ে টাট্‌কা শিবাম্বু টানলেই খুব তাড়াতাড়ি মাথা ধরা সেরে যায়। যাদের সাইনাসের (Sinus) জন্য মাথা ধরে তারা এই প্রণালীতে শিবাম্বু টানলে খুব তাড়াতাড়ি এই রোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন। অন্য কোন উপায়েই এই রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

● **কানের ব্যথা—**

কানের ব্যথায় তুলোতে বাসি শিবাম্বু লাগিয়ে ব্যথাযুক্ত কানের ছিদ্র বন্ধ করে রাখলেই ব্যথা সেরে যায়।

● **টনসিলের রোগ—**

সাধারণতঃ টনসিল দুর্বল হয়ে বার বার রোগাক্রান্ত হয়ে গলা ব্যথা ও মাথায় যন্ত্রণা হয়। সর্দি কাশি তাদের লেগেই থাকে। পরে টনসিল পেকে পূঁজ হয়ে পেট ও বুকের নানারূপ রোগের জন্ম দেয়। ফলে রোগীরা কখনও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে রোগাক্রান্ত টনসিল কেটে বাদ দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে তার ফল আরও মারাত্মক হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শিবাম্বু চিকিৎসা খুব ফলপ্রদ।

প্রথমে প্রত্যহ সকালে নাক দিয়ে শিবাম্বু পান করতে হবে। পরে সামান্য তুলোয় বাসি শিবাম্বু লাগিয়ে টনসিল দুটোতে ভাল করে মালিশ করে দিতে হবে। তা হলেই রোগ থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবেন।

❑ পুরাতন ও জটিল রোগে প্রয়োগ ❑

যে সব রোগ দীর্ঘ দিন ধরে চলছে অথবা যে সব রোগ অতি জটিল সে সব ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। শুধু শিবাম্বু পান বা মালিশ দিয়ে কাজ চলবে না। এই সব ক্ষেত্রে শিবাম্বু উপবাস বিশেষ দরকার হবে। তবে

রক্তের চাপ কম থাকলে অথবা জীবনী শক্তি খুব ক্ষীণ হয়ে এলে উপবাস চলবে না। সে সব ক্ষেত্রে প্রথমে শিবাম্বু পান ও মালিশ করে একটু সুস্থ হয়ে উঠলে পরে প্রয়োজন বোধে উপবাস করা যেতে পারে। পূর্বোল্লিখিত নিয়মে উপবাস ও উপবাস ভঙ্গ করতে হবে। এখানে কয়েকটি পুরাতন ও জটিল ব্যাধির বিষয় বলা হচ্ছে—

● হাঁপানী—

হাঁপানী যদিও ফুসফুসের ব্যাধি তবু এই ব্যাধিতে পাকযন্ত্রের (Digestive System) বিশেষ ত্রুটি থাকে। পেটে বায়ু জমে ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। এই জন্যই রোগের প্রাবল্য অসহনীয় হয়ে পড়ে—হাঁপানী রোগীর প্রথমেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া দরকার। এ জন্য এসব রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমেই সামর্থ অনুযায়ী কিছুদিন শিবাম্বু উপবাস করা প্রয়োজন। তা হলেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে হজম শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এবং রোগের প্রকোপ কমে আসবে। এই অবস্থায় সকাল ও সন্ধ্যায় **পবন মুক্তাসন, বিপরীত-করণীমুদ্রা ও যোগমুদ্রা** করতে হবে। পরে সহজ প্রাণায়াম পাঁচ মিনিট ও ভ্রমণ প্রাণায়াম দশ মিনিট করে বাসি শিবাম্বু সকালে স্নানের আগে মালিশ করলে খুব তাড়াতাড়ি এই রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

● অজীর্ণ—

এই রোগে কয়েকদিন শিবাম্বু উপবাস দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করা দরকার। এতে হজম শক্তি বৃদ্ধি পেলে খাদ্যের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বেশী সময় লাগবে না।

শিবাম্বু-পান ও শিবাম্বু মালিশ প্রথমতঃ দিনে তিন বার করতে হবে। পেটে ও বুকে বেশীক্ষণ, পায়ের তলায় মালিশ করতে হবে সকালে ও শোবার সময়।

এই সঙ্গে মাঝে মাঝে এক গ্লাস টাট্‌কা শিবাম্বুর সঙ্গে লবণাক্ত জল মিশিয়ে ডুস দিয়ে পেট পরিষ্কার করতে হবে। সব সময় সহজ পাচ্য খাদ্য এক তৃতীয়াংশ পেট খালি রেখে খেতে হবে। দু-বেলার খাবার একটা নির্দিষ্ট সময়ে খেতে হবে। রাত্রির খাওয়া যেন রাত্রি আটটার আগেই শেষ হয়।

● পিত্ত পাথুরী (Gall Stone)

এই রোগেও চিকিৎসার প্রথম দিকে পাঁচ ছয় দিন শিবাম্বু-উপবাস করা

দরকার। তা হলেই ব্যথা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। উপবাসের সময় ডান দিকের পাঁজরার নীচের দিকে শিবাম্বু পুলটিস অন্ততঃ দু'বেলা এক ঘন্টা করে রাখতে হবে। পথ্যের ভিতর স্নেহ জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে শুধু ক্ষারধর্মী পথ্য খেতে হবে।

● **যক্ষ্মা (Pthysis)** —

এই রোগে প্রথমেই ক্ষুধা নষ্ট হয়ে দেহ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এজন্য শিবাম্বু-পানের পর ক্ষুধা বৃদ্ধি পেলে পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা দেহের শক্তি বৃদ্ধি করে রোগকে নির্মুল করতে হবে। ক্ষয় রোগ দেহের যে কোন জায়গায় হোক না কেন ক্ষুধা বৃদ্ধি না করে এই রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করা অসম্ভব। এই রোগে আক্রান্ত স্থানের উপর আধ ঘন্টা শিবাম্বু পুলটিস রাখতে হবে এবং সর্ব শরীরে শিবাম্বু মালিশ করতে হবে। ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। শিবাম্বু মালিশের সময় শিবাম্বু সামান্য গরম করতে হতে পারে, বিশেষ করে শীতের সময়।

● **মধুমেহ (Diabetis Mellitus)** —

এ ক্ষেত্রে শিবাম্বু-পান খুব অল্প দিনের মধ্যে রক্তের শর্করার পরিমাণ কমিয়ে আনে। এজন্য অন্ততঃ দিনে তিন বার শিবাম্বু-পান করতে হবে। তবে শিবাম্বু-উপবাস যদি পাঁচ ছয় দিনের জন্য করা যায় তবে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যাবে। এই সঙ্গে মালিশ অন্ততঃ সকালে ও সন্ধ্যার সময় করা দরকার।

● **চক্ষুর রোগ (Eye Disease)** —

(ক) চোখ দিয়ে জল পড়া ঃ এই রোগ বৃদ্ধ বয়সে অনেকেরই হয়। কোন চিকিৎসায় এর উপকার হয় না। যদি টাট্‌কা শিবাম্বু (ঠাণ্ডা করে) "আই কাপ"-এ (Eye Cup) নিয়ে দিনে দু'বার চোখ ধোয়া যায় তবে এই রোগ সাত দিনে সেরে যাবে। প্রতিবারই ঐ শিবাম্বু অন্ততঃ এক মিনিট করে চোখে লাগিয়ে রাখতে হবে। এই রোগে শিবাম্বু-পান না করলেও চলবে।

(খ) চোখ-ওঠা (Conjunctivitis) — অনেক সময় চোখে প্রদাহ হয়ে চোখে জ্বালা ও চুলকানি হয়। অনবরত জল পড়ে। যেখানে জল সেখানেই ভেজে যায়। এ সব ক্ষেত্রেও Eye cup-এর সাহায্যে টাট্‌কা শিবাম্বু দিয়ে চোখ ধোয়ালে দুই তিন দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যায়।

(গ) ক্ষীণ দৃষ্টি—বয়স বাড়ার সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি ক্রমে কমে আসে। সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর বয়স থেকেই খালি চোখে পড়াশুনা করতে বেশ অসুবিধা হতে থাকে। এটা জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। একে 'চাল্লিশে' ধরা বলে। তবে যাদের অল্প বয়সে থেকেই দৃষ্টি-শক্তি কমে যেতে থাকে তাদের নিয়েই ভাবনা। শিবাম্বুকল্পে সব রকমের দৃষ্টি-শক্তির ত্রুটি সেরে যায়। শুধু সকালে ও সন্ধ্যায় এক মিনিট করে টাট্‌কা শিবাম্বু ঠাণ্ডা করে eye cup দিয়ে চোখ ধুতে হবে। আর দু'বেলা এক গ্লাস টাট্‌কা শিবাম্বু পান করতে হবে। তবেই জীবন-ভোর দৃষ্টিশক্তির ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

(ঘ) চোখের ছানি (Cataract)– এই রোগ বৃদ্ধ বয়সে অনেকেরই হয়ে থাকে। তবে কম বয়সেও হয়। বিশেষতঃ যাদের মধুমেহ (diabetis Mellitus) থাকে তাদের এ রোগ হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে যে কোন কারণেই এ রোগ হোক্ না কেন শিবাম্বুকল্প সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি রোগ অল্প দিনের হয় তবে দু'বেলা শিবাম্বু-পানের সঙ্গে চোখ দুটি টাট্‌কা শিবাম্বু ঠাণ্ডা করে eye cup -এর সাহায্যে প্রতি চোখ এক মিনিট করে ধুতে হবে। যদি রোগ বেশী দিনের হয়ে থাকে (অর্থাৎ ৫/৬ মাস) তবে এই সঙ্গে কিছু দিন শিবাম্বু উপবাস করা প্রয়োজন। অবশ্য কয়েক বছরের ছানি যদি পরিপক্ক হয়ে থাকে তবে অস্ত্রোপ্রচার ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।

যদি চশমাধারী কেউ হঠাৎ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চশমা ছাড়াই পড়াশুনা করতে সমর্থ হন তবে এই রোগের আশঙ্কা করতে হবে। তারা রোদের মধ্যে সব কিছুকে কুয়াসাছন্ন অবস্থায় দেখেন কিন্তু ছায়ায় ভাল দেখেন। দূরের জিনিষ দেখতে কষ্ট হয়।

আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই রোগের সূচনাতেই শিবাম্বুপান সহ দু'বেলা শিবাম্বু দিয়ে চোখ ধুয়ে এই রোগ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পেয়েছেন। তাঁর আরোগ্যের পদ্ধতি চিঠি মারফৎ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন বলেই জোরের সঙ্গে সবাইকে এর ব্যবহারের কথা বলতে পারছি।

● **অর্শ (Piles)** —

এই রোগ যকৃতের দোষে হয়ে থাকে। যাদের দীর্ঘদিন যাবৎ কোষ্ঠকাঠিন্য তাদেরই এই রোগ হয়। অনেক ক্ষেত্রে রক্তপাত সহ খুব যন্ত্রণা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে শুধু বলির সৃষ্টি হয় কিন্তু যন্ত্রণা থাকে না। উভয় ক্ষেত্রেই

কিছুদিন শিবাম্বু-উপবাস অবশ্য কর্তব্য। সেই সঙ্গে মালিশও দিনে দু'বার করতে হবে। যন্ত্রণার ক্ষেত্রে তুলো বা ছোট ন্যাকড়া বাসি শিবাম্বুতে ভিজিয়ে পায়খানার পর মলদ্বারের ভিতর অন্ততঃ দু'ঘন্টা রাখলেই যন্ত্রণা কমে যায় ও বলি শুকিয়ে যেতে থাকে। পরে তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কাচের পিচকিরির মাথায় বারো নম্বরের ক্যাথিটার লাগিয়ে গুহ্যদ্বারের ভিতর বাসি শিবাম্বু ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রাখলে খুব তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যাবে।

● **ক্যান্সার (Cancer) —**

এই রোগটি শুধু দুরারোগ্য নয় প্রায় অসাধ্য। প্রথম থেকে ধরা পড়লে রোগ কিছুটা প্রশমিত করা যায় কিন্তু নির্মূল করা যায় না। যারা শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করেছেন তাদের এই রোগ কখনই হবে না।

রোগ ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করা যায়, তবে সহজেই এই রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে, প্রথমে অন্যান্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে শেষ অবস্থায় শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করেন বলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিবাম্বুকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে জীবনী-শক্তি প্রায় নিঃশেষিত। তাই শিবাম্বু যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। বিশেষতঃ ক্যান্সার কোষে যদি কোন ধাতব পদার্থের স্পর্শ (metalic touch) লেগে থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে রোগ কোন মতেই সারবে না।

যদি রোগী খুব দুর্বল না হয়ে থাকে তবে কিছুদিন শিবাম্বু-উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হয়। সেই সঙ্গে মালিশ দিনে তিনবার করতে হবে। উপবাস-ভঙ্গের পর পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে দিনে তিন বার শিবাম্বু-পান করলে রোগ সেরে যাবে। (৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন ক্যান্সার ও এইড্‌স রোগে বিশেষ ব্যবস্থা)

● **বাত ব্যাধি (Rheumatism)–**

এই ব্যাধি খুব কষ্টদায়ক। বাইরে থেকে মানুষ এই রোগের কষ্ট বুঝতে পারে না কিন্তু বোঝে তার যন্ত্রণা। এই অবস্থা বেশী দিন চললে সন্ধিস্থলের আকৃতিগত পরিবর্তন হয়ে রোগ অসাধ্য হয়ে পড়ে। এই কারণে প্রথম থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করা উচিত।

এই রোগে প্রথমেই অন্ততঃ ছয় দিন শিবাম্বু-উপবাস করা উচিত। তা হলে দেহের সঞ্চিত বিষ (Uric acid) দেহ থেকে বের হয়ে রোগের তীব্রতা কমিয়ে দেবে। উপবাস বন্ধ করার পরও আমিষ খাদ্য, বিশেষতঃ ডিম ও মাংস, একেবারে বর্জন করতে হবে। স্নেহ-জাতীয় পদার্থ অসম্ভব কম খাবেন। তবে মিষ্ট ফল খেতে পারবেন।

শরীর একটু সুস্থ হলে পশ্চিমোত্তানাসন, ভূজঙ্গাসন, হলাসন, উষ্ট্রাসন, উৎকটাসন, বজ্রাসন ও শলভাসন করলে রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাবে। তার সঙ্গে সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ প্রাণায়াম করা দরকার।

● **হৃদরোগ, রক্তচাপ ও হৃদশূল** (Angine Pectoris)

অজীর্ণ ও হৃদরোগের মূল কারণ প্রায় এক। উভয় ক্ষেত্রেই নিরন্তর চিন্তা ও মানসিক আঘাত থেকেই হজম শক্তি ব্যাহত হয়ে হৃদরোগ ও রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় অরুচি, হজমের গণ্ডগোল, শারীরিক অবসাদ, অল্প পরিশ্রমেই বুকে চাপ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ে শোথও দেখা দিতে পারে।

যে কারণেই এই রোগ হোক্ না কেন, শিবাম্বুকল্প সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। রক্তচাপের ক্ষেত্রে অনেক সময় বহুমূত্র জাতীয় রোগে রক্তবহ নাড়ীর স্থিতিস্থাপকতার (elasticity) হ্রাস বা রক্তবহ নাড়ীর ভিতরের ছিদ্রের আয়তন কমলে রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়। আবার হৃদযন্ত্র দুর্বল হলেও রক্তের চাপ কমে যায়। সকল ক্ষেত্রেই শিবাম্বু এসব ত্রুটি সত্বর দূর করে দিতে পারে।

আমরা জানি যে, শিবাম্বুর কাজ দেহ-যন্ত্রের সমস্ত অবরোধ অপসারণ করে। তাই শিবাম্বু-পান সমস্ত রক্ত চলাচল ব্যবস্থার অবরোধ দূর করে সহজেই হৃদ্‌পিণ্ড ও রক্তবহ নাড়ীকে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে দেবে। তা ছাড়া যার হৃদশূলে ভোগেন তারাও এই প্রকল্পের সাহায্যে ঐ ব্যাধি থেকে সহজেই মুক্তি পাবেন।

প্রথমে দিনে তিনবার তিন গ্লাস শিবাম্বু পান করতে হবে। তার সঙ্গে শিবাম্বু (বাসি) দ্বারা দিনে অন্ততঃ দু'বার মালিশ অবশ্য কর্তব্য। মালিশের পর কিছুক্ষণ রৌদ্রে থাকলে আরও ভাল হয়।

কোনরূপ নেশা করা চলবে না। খাদ্য-দ্রব্য মশলা ছাড়া খেতে হবে। যদি

শোথ থাকে তবে লবণ কোন মতেই খাওয়া যাবে না। ক্রমে সুস্থ হলে শিবাম্বু সকালে একবার পান করলেই চলবে। তখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরে আসা চলবে। তবে সমস্ত রকমের ভাজা, ঝাল পরিত্যাগ করে চলতে হবে। চিনির পরিবর্তে গুড় এবং প্রত্যহ সকালে দু'চামচ মধু আজীবন খেয়ে গেলে রোগ কখনও পুনরাক্রমণ করবে না।

ক্যান্সার এবং এইড্স (AIDS) রোগে বিশেষ ব্যবস্থা

ক্যান্সার এক ধরণের অর্বুদ যা দেহের যে কোন স্থানে দেখা দিয়ে পরে লাসিকা প্রবাহের মাধ্যমে দেহের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে গিয়ে রোগীকে অসহায়ের মত অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে হয়। এই রোগের কিছু উত্তেজক কারণ exciting cause থাকলেও প্রকৃত কারণ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আপাততঃ দেখা যায় দেহের পুষ্টির জন্য আমরা যা খাই তা সমস্ত দেহের তন্তুতে ছড়িয়ে সমস্ত দেহকেই সমভাবে পুষ্ট করে। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় দেহের কিছু তন্তুর মধ্যে একটা "স্বার্থপর প্রবণতা" দেখা দেয় যার ফলে দেহের সামগ্রিক পুষ্টিকে উপেক্ষা করে সেই সব তন্তু পুষ্ট হয়ে একটা গুলির মত হয়ে ধীরে ধীরে আরও বেড়ে সমস্ত দেহকে শীর্ণ করে দেহের নানা স্থানে এই ভাবে বলের মত গুলির সৃষ্টি করে। পরে তা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে পরিণত হয়ে রোগীকে অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। এই রোগে প্রথমে ঔষুধ প্রয়োগে চিকিৎসা করে ব্যর্থ হয়ে নানা রকম ইলেকট্রিক Ray এবং পরে অস্ত্র চিকিৎসায় চলে যেতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে রোগের চেয়েও চিকিৎসার যন্ত্রণা আরো বেশী কষ্টদায়ক হয়। যদিও প্রথম থেকে শিবাম্বু প্রয়োগ করলে অতি সহজে এবং অল্প সময়ে এই দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে তবু মানুষ সমস্ত চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে নিরাশ হয়ে এই পদ্ধতির দুর্নাম করে। কোন অস্ত্র চিকিৎসার পর এই রোগ দুরারোগ্য হয়ে যায় তখন শিবাম্বু প্রয়োগেও রোগারোগ্য কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রথম থেকেই প্রয়োগ করলে এই রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।

ক্যান্সার চিকিৎসায় নীচের নিয়ম অনুসারেই চিকিৎসা পরিচালনা করতে হবে—

(১) ১০ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত শিবাম্বু উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। ভগ্ন স্বাস্থ্য এই উপবাসে ক্ষতিকারক হবে না। বরং খাদ্য হজম করার পরিশ্রম থেকে সমস্ত পরিপাক যন্ত্র বিশ্রাম পাওয়ায় দেহ সহজেই প্রতিরোধ ক্ষমতা লাভ করে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাবে। সেই সময় তার দিনের শিবাম্বু পানের সঙ্গে প্রচুর জল খেতে হবে।

(২) বাসি শিবাম্বু দ্বারা দিনে অন্তত ৪ বার সারা শরীরে মালিশ করতে হবে। এই মালিশের দ্বারা শরীর থেকে রোগ বিষ বেড়িয়ে যেতে সাহায্য করবে। যদি কোথাও 'টিউমার' দেখা দেয় তবে সেখান মালিশ না করে দিনে ৪ বার শিবাম্বু পুলটিশ দিতে হবে।

(৩) কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেক দিন শিবাম্বু ও জল মিশিয়ে "ডুস' (douche) দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া এত ফলপ্রদ যে রোগের ৫০ শতাংশই এই কোষ্ঠশুদ্ধিতে নির্মূল হয়।

'এইড্‌স' (AIDS) সম্বন্ধে বিশেষ বিধি

"এইডস্" প্রকৃতপক্ষে কোন রোগ নয়। রোগের লক্ষণ, আমাদের দেহে প্রকৃতি দত্ত রোগ প্রতিরোধী একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। এই রোগে সেই ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই রোগের প্রকৃত নাম Acquired Immuno Defficiency Sydretrone। প্রত্যেকটি লক্ষণের আদ্যক্ষর নিয়ে এই রোগের নামকরণ হয়েছে। তাই রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই এই চিকিৎসা প্রয়োগ করলে কোন মতেই রোগ বাড়তে পারবে না। বরং সহজেই নির্মূল হবে।

প্রথমেই শিবাম্বু উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। এইভাবে প্রতিরোধী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তবে শিবাম্বু বিধির খাদ্য খেতে পারা যাবে। শিবাম্বুর পুষ্টিকর পদার্থ অতি সহজেই রোগ নির্মূল করে সুস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়ে দিবে। এই প্রসঙ্গে "লাইফ সাইন্স ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ইউ. ই. এস-এর অধ্যক্ষ ডাঃ জন এফ. ও. কুইন এর (Dr. John F.O. Quin) এর মন্তব্য বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি তার Urine Theraphy (Self Healing Through Intrinsic Medicine) গ্রন্থে লিখেছেন—

"আমি ভবিষদ্বানী করছি যে, ভবিষ্যতে যে এরপর শিবাম্বুকল্পই AIDS রোগের একমাত্র চিকিৎসা হবে।" টানজানিয়া থেকে ভিক্টোরিয়া শেম লিখেছেন

যে, তিনি ১০ জন এইড্‌স্ রোগীর উপর এই চিকিৎসা প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করতে পেরেছেন। ভারতে শিবাম্বু প্রচারের পুরোধা ডাঃ জি. কে. ঠক্করের মতে ক্যান্সার ও এইড্‌স্ কোন রোগ নয় কিছু জৈব প্রকৃতির বিকৃতি। তাই কোন ঔষুধই এখানে কার্যকরী নয়। একমাত্র শিবাম্বুর মত জৈব রসায়নই এই বিকৃতি থেকে দেহকে সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে এনে দিতে পারে।

বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিধি

১। পায়োরিয়া এবং ঝিভে ও মুখের মধ্যে ঘা—

এই রোগে দাঁতের গোড়া ফুলে পূঁজ হয়ে মুখে খুব দুর্গন্ধ হয়। দাঁত নড়ে যায়। পায়োরিয়া থেকে যকৃতের রোগ হয়। হজম শক্তি কমে যায়। পায়োরিয়া থেকে শ্বেতী রোগ পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই রোগকে অবহেলা করা উচিত নয়। এই রোগে শিবাম্বু-পান সহ সকালে ও শোবার সময় টাট্‌কা শিবাম্বু দিয়ে কুলকুচা করা দরকার এবং বাসি শিবাম্বু দিয়ে সমস্ত দাঁতের গোড়া ভাল করে মালিশ করা উচিত। তা হলেই দাঁতের গোড়া শক্ত হয়ে রোগ তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

২। এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্—

ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগ-স্থলে প্রদাহ হয়ে এই রোগ হয়। অনেকদিনের আমাশয় থেকে জ্বর, পেটের ডান দিকের নীচে ব্যথা ও বমি হয়ে এই রোগের সূত্রপাত হয়। এই রোগ প্রবল হলে অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু রোগ তেমন উগ্র না হলে শিবাম্বু-পান ও ব্যথার স্থানে শিবাম্বু পুলটিস্ দিলে রোগ খুব অল্প দিনের মধ্যেই সেরে যায়। শরীর খুব দুর্বল না হলে উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করলে ফল খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে।

৩। নেফ্রাইটিস্—

কিডনির প্রদাহ হয়ে বা অন্য কোন কারণে মূত্র নালীতে এই রোগ হয়। প্রথমে সামান্য জ্বর হয়ে মুখ ও চোখ ফুলে গিয়ে প্রস্রাব কমে যায়। এই অবস্থায় শিবাম্বু চিকিৎসা খুব ফলপ্রদ। চিকিৎসার প্রারম্ভে দিনে চার বার শিবাম্বু -পান করা দরকার। প্রস্রাব কমে যায় বলে কম শিবাম্বু পান করে পরে ঠাণ্ডা জল পান করতে হবে। তা হলেই প্রদাহ কমে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে

ধীরে ধীরে উপসর্গ-গুলি কমে যাবে। রোগ জটিল হলে উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করা যেতে পারে, সাধারণতঃ দশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ রোগ -মুক্তি হয়। তবে প্রস্রাব পরীক্ষা করেই নিশ্চিত হতে হবে।

৪। মূত্র কৃচ্ছতা ও মূত্রস্বল্পতা—

প্রস্রাবের পথে প্রদাহ হয়ে বা অন্য কোন কারণে মূত্র-নালীতে অবরোধ হলে এই রোগ হয়। কোন কোন সময় কিড্‌নী আক্রান্ত হয়েও এই রোগ হতে পারে। সমস্ত ক্ষেত্রেই শিবাম্বু প্রয়োগে সত্ত্বর রোগ আরোগ্য লাভ হয়। রোগ জটিল হলে উপবাস দিতে হবে। তা না হলে দিনে চার বার শিবাম্বু-পান ও মালিশ করে এই রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারা যাবে। যদি প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হয়ে থাকে তবে সুস্থ অন্য ব্যক্তির প্রস্রাব পান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের প্রস্রাব অন্য পুরুষের জন্য, এবং একজন সুস্থ স্ত্রীলোকের প্রস্রাব স্ত্রী রোগীর জন্য ব্যবহার করতে হবে।

৫। স্বপ্নদোষ ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্য—

এই রোগে হজম-শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে ভাল ঘুম হয় না। পেটে বায়ু জমে ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। ফলে, হালকা ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখে বীর্যপাত হয়। এজন্য এই রোগে শিবাম্বু পান করে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করতে হবে। তা হলে ঘুম গভীর হয়ে স্বপ্ন দোষ দূর হবে। তবে খাদ্য বিষয়ে খুব সতর্ক হতে হবে। মশলা ছাড়া সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করে সেই সঙ্গে সকালে ঘুম থেকে উঠে দু'গ্লাস জল পান করে পবন মুক্তাসন, বিপরীত করণী মুদ্রা, শলভাসন ও যোগমুদ্রা করে কোষ্ঠ পরিষ্কার করতে হবে। সম্ভব হলে বিকালে পশ্চিমোত্তানাসন, ভূজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন, শীর্ষাসন প্রতিটি দু'মিনিট ক'রে করলে তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যাবে। যাদের ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য আছে তাদের ক্ষেত্রে লিঙ্গমূল থেকে গুহ্যদ্বার পর্যন্ত অঞ্চল সকাল ও সন্ধ্যায় বাসি শিবাম্বু দিয়ে দু'শ বার সজোরে মালিশ করতে হবে।

৬। সর্প দংশন ও বিষাক্ত পোকার কামড়—

সর্প দংশনের সঙ্গে সঙ্গে স্বমূত্র বা সুস্থ দেহী অন্যের মুত্র পান ক'রে বাসি শিবাম্বু দিয়ে দষ্টস্থান বেঁধে রাখলে সাপের বিষ ক্ষতি করতে পারবে না। তবে দষ্ট স্থানের ঠিক উপরে শক্ত দড়ি দিয়ে দুটি বাঁধন ক'রে নিতে হবে। বিষধর

পোকার কামড়ের বেলায় দড়ির বাঁধন ছাড়া এই ব্যবস্থা নিলে শরীরে বিষক্রিয়া হবে না।

৭। খোলসা ওঠা—

এটি অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাধি। অন্য কোন ঔষধেই সারে না। একমাত্র শিবাম্বু পান, মালিশ ও উপবাস এই রোগ নির্মূল করতে পারে। এই রোগে স্বাস্থ্য খারাপ থাকে না বলে প্রথম থেকেই উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। মাছের আঁশের মত খোসা ওঠা বন্ধ করার জন্য বাসি শিবাম্বু দিনে তিন বার দু'ঘন্টা করে মালিশ করতে হবে, খাদ্যে আমিষ কোন মতোই থাকা চলবে না।

৮। একশিরা ও কোড়গু—

অণ্ডকোষে আঘাত বা অন্য কোন রোগ জনিত প্রদাহে কোষে জলসঞ্চয় বা কোষ স্ফীত হলে তাকে কোষবৃদ্ধি বলে। যদি একদিকের কোষ স্ফীত হয় তবে তাকে একশিরা বলে এবং উভয় কোষ স্ফীত হলে তাকে কোড়গু বলে। কখনও কখনও খুব ব্যথা, জ্বর বা টন্ টন্ করে, কখনও কখনও কোন বেদনা থাকে না। সাধারণতঃ রেতঃ রজ্জুর সঙ্গে যে সমস্ত লসিকা-নালী থাকে সেগুলির প্রদাহকেই একশিরা বলে। তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই শিবাম্বু সমভাবে প্রযোজ্য। সমস্ত ক্ষেত্রেই শিবাম্বু উপবাস দিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। উপবাস অন্ততঃ ছয় দিন করলেই ব্যথা ও ফোলা কমে আসবে। তারপর প্রত্যহ দু'বেলা অণ্ডকোষের উপর সজোরে বাসি শিবাম্বু অন্ততঃ পনের মিনিট করে মালিশ করতে হবে। তা হলে অতি সত্ত্বর আরোগ্য লাভ করা যাবে। এক্ষেত্রেও খাদ্য-নীতি কঠোর ভাবে পালন করা কর্তব্য।

৯। বন্ধ্যাত্ব (Sterility) —

স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণের অক্ষমতাকেই বন্ধ্যাত্ব বলে। ডিম্বকোষের ব্যাধি, কলন-নালিতে (fallopian tube) অবরোধ, জরায়ুতে কোনরূপ ব্যাধি এই অক্ষমতার কারণ হতে পারে। আবার পুরুষের শুক্রদোষ বা স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অপুষ্টি থেকেও এই রোগ হতে পারে। তবে এই অক্ষমতা যে কোন কারণেই হোক্ না কেন শিবাম্বুকল্প দ্বারা তার নিরাময় অবশ্যই হবে।

প্রথমতঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কিছুদিন দিনে অন্ততঃ তিন বার শিবাম্বু পান করে রজোদর্শনের পর যথা নিয়মে সংযত ভাবে সহবাস করবেন। তাতেই ফল পাওয়া যাবে। জরায়ু বা শুক্রকীটের অপুষ্টি হেতু বন্ধ্যাত্ব হয়ে থাকে তবে প্রত্যহ একবার করে স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর শিবাম্বু পান করবেন। তা হলেই অক্ষমতা দূর হয়ে সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা লাভ করা যাবে।

১০। স্থৌল্য (Obesity) —

কতকগুলি স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের দ্বারা মানুষ অতিরিক্ত মোটা হয়। অতিমাত্রায় আহার, শ্রম বিমুখতা এবং কতকগুলি গ্রন্থির দোষ এই রোগের প্রধান কারণ। দিবা-নিদ্রাও একটি অন্যতম কারণ। যে কোন কারণেই মোটা হলে শিবাম্বুকল্প গ্রহণ ক'রে স্থূলতা কমানো সম্ভব হবে।

মোটা হলে প্রথমেই শিবাম্বু-উপবাস অন্ততঃ এক মাস করতে হবে। তা হলেই অতিরিক্ত মেদ ঝ'রে যাবে এবং তারপর স্বাস্থ্যবিধি মেনে আহার-বিহার করলে আর দেহে অতিরিক্ত চর্বি জমতে পারবে না।

১১। কৃশতা (Slenderness) —

সাধারণতঃ হজমশক্তির অভাব হলে খাওয়ায় অরুচি হয়। এজন্য যে সব জিনিষ জোর করে খাওয়া হয় তাও ভালভাবে হজম হয় না এবং দেহ তা থেকে পুষ্টি আহরণ করতে না পারায় দেহ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অনেক সময় গ্রন্থির ত্রুটি থাকার দরুণ শরীরে চর্বি বা মাংস জমতে না পারায় শরীর রোগা হয়ে যায়। যে কোন কারণেই শরীর কৃশ হলে শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করলে মোটা না হলেও স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়।

প্রথমেই দিনে তিন বার শিবাম্বু পান করতে হবে। তারপর পেট পরিষ্কার হয়ে ক্ষুধা যখন বৃদ্ধি পাবে তখন পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে কিছুক্ষণ শারীরিক ব্যায়াম ও যোগাসন করলে শরীরে মাংস ধরবে এবং শরীর দেখতে সুন্দর হবে—জীর্ণশীর্ণ ভাব কেটে যাবে।

সতর্কতা — দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে শিবাম্বুকল্প গ্রহণের পর প্রথমে খুব উপকার হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন ভয়ে ভয়ে অনেকেই এই চিকিৎসা ছেড়ে দেন। এ সব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পেটে অত্যধিক

বায়ুজমা, অনিদ্রা, অরুচি, মাথা ঘোরা, শারীরিক দৌর্বল্য ও ওজন হ্রাস প্রধান। এসব উপসর্গ কিন্তু রোগ আরোগ্যেরই লক্ষণ। দেহ রোগ মুক্ত হয়ে দেহ গঠনের উপযুক্ত খাদ্য না পেলেই এ সব উপসর্গ দেখা দেয়। শরীর গঠনের জন্য পাকযন্ত্রে যে সব অতিরিক্ত জারক রস ক্ষরিত হয় উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তা বিকৃত হয়েই এসব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে এসব উপসর্গ দূর করার জন্য প্রথমে কিছুদিন শিবাম্বু-পান বন্ধ রেখে শুধু বাসি শিবাম্বু মালিশ করে যেতে হবে। খাদ্য তালিকায় ঐসময় গরুর খাঁটি দুধ খুবই আবশ্যক। প্রত্যহ অন্ততঃ এক লিটার পরিমাণ দুধ খেতে হবে। অসমর্থ হলে প্রত্যহ সকালে দশটি সয়াবীন, পাঁচটি বাদাম, দশটি ছোলা ও চারটি কিস্‌মিস্ ভাল করে ভিজিয়ে বেটে আখের গুড় দিয়ে সরবৎ করে খেতে হবে। তা হলেই ঐসব উপসর্গ চলে যাবে। আর প্রধান আহারের সময় কিছু আদা বাটা, দু'চামচ সয়াবীন বা সূর্যমুখী বা সাফোলা তেল, সামান্য বীটনুন দিয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে খাবেন। দুধের পরিবর্তে বাড়িতে পাতা দৈ (টক না হতে) জলে মিশিয়ে লস্যি করে খেতে পারেন। পেটে বায়ু বেশী হলে আগের দিন রাত্রে ছয় টুকরো শুকনো আমলকি সামান্য জোয়ানের সঙ্গে এক কাপ জলে ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সকালে খেলেও উপসর্গ চলে যাবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিশুর ক্ষেত্রে শিবাম্বু বিধি

১। শৈশবে শিশুর খাদ্যাভ্যাস ও যত্ন ঃ

শিবাম্বুকল্প অভ্যাস করার প্রকৃষ্ট সময় শৈশব কাল। কারণ তখন মনে কোন সংস্কার দানা বাঁধতে পারে না। তাই, যা কিছু ভাল বলে দেওয়া যায় শিশু তা সহজেই গ্রহণ করে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ছয় মাস বয়স থেকে সকালে ও বিকালে টাট্‌কা শিবাম্বু থেকে এক চামচ করে পান করালে তাদের দেহে সহজে কোন রোগ প্রবেশ করতে পারে না। তবে ঐ শিবাম্বু-পানের আধ ঘন্টার মধ্যে কিছু খাওয়ানো চলবে না। এই অভ্যাস করালে শিশুদের কখনও বিছানায় প্রস্রাব করার রোগ দেখা দিবে না। যে সব শিশু বড় হয়েও প্রস্রাব করে, তারা যদি শুধু সকালের প্রস্রাব থেকে এক কাপ করে সাত দিন পান করে তবে অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ রোগ সেরে যাবে।

খুব ছোট থাকা অবস্থায় শিশুদের চার দিনের বাসি শিবাম্বু স্নানের আগে মালিশ করার পরে কিছুক্ষণ রোদে রেখে স্নান করালে দেহ দৃঢ় ও পুষ্ট হয়। মালিশের আগে শিবাম্বু গরম ক'রে নেওয়া ভাল।

শিশুদের খুব নরম বিছানায় শোয়নো উচিত নয়। শক্ত বিছানায় শোয়ালে শরীরের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু নরম বিছানায় শোয়ালে হাড়ের গঠন ঐ কচি অবস্থায় বিকৃত হতে পারে এবং দেহে অনেক রোগের আশ্রয় স্থল হওয়ায় সাহায্য করে।

অনেক পিতামাতা নিজেদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য দেখাবার জন্য শিশুদের শরীরে অনাবশ্যক গরম জামা-কাপড় জড়িয়ে রাখেন। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে শৈশব অবস্থা থেকেই শিশুরা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়ার মত দেহের লোমকূপ দিয়েও আমরা

শ্বাস গ্রহণ করি। এই চামড়া আমাদের ফুসফুস ও কিড্‌নীর কাজ করে বলে চীন দেশে একে তৃতীয় ফুসফুস ও কিড্‌নী বলে। গরম জামা দ্বারা বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলে দেহে প্রতিরোধী শক্তি জন্মাতে পারে না। ফলে, শিশুরা চিররুগ্ন হয়ে পড়ে।

শিশুদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া দরকার। ছয় মাস পর্যন্ত শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়া উচিত। মনে রাখবেন মাতৃ-দুগ্ধের কোন বিকল্প নেই। মাঝে মাঝে গরুর দুধ মিশিয়ে বার্লি দেওয়া যেতে পারে। ঐ সময় শিশু-খাদ্যের নানা বিজ্ঞাপনে ভুলে টিনের সংরক্ষিত খাদ্য খাওয়ালে ওদের ভবিষ্যৎ খারাপ হবে।

ছয় মাসে দাঁত উঠলে ভাত, ডাল, আলু সিদ্ধ, ফল সিদ্ধ ও দুধ-ভাত দেওয়া উচিত। ডিম ও মাংস একেবারে দেওয়া উচিত নয়। বড় মাছ না দিলেই ভাল হয়। অল্প বয়সে ডিম খাওয়ালে ছোট বেলাতেই দৃষ্টি শক্তি কমে গিয়ে চশমা পরতে বাধ্য হতে হবে। মায়ের বুকের দুধ না থাকলে তিন মাস পর্যন্ত গরুর দুধের সমান সমান জল মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। চার মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত অর্ধেক জল ও ছয় থেকে আট মাস পর্যন্ত এক চতুর্থাংশ জল এবং নয় মাস থেকে জল না মিশিয়েই দুধ খাওয়ানো চলতে পারে।

প্রথম প্রথম শিশুরা ভাত বা অন্য কোন শক্ত খাদ্য খেতে পারে না; তখন তা দুধে গুলে খাওয়াতে হবে। মিষ্টি আলু সিদ্ধ ক'রে দুধে গুলে খাওয়ালে পেটের গণ্ডগোল থাকবে না এবং কোষ্ঠ-কাঠিন্য কখনই হবে না।

ছোট বেলায় মিষ্টি বেশী খাওয়ানো উচিত নয়। এতে শুধু ক্রিমির উপদ্রবই বাড়ে না ছোটবেলা থেকেই দাঁতে পোকা লেগে ভবিষ্যতে দাঁতের সর্বনাশ ডেকে আনে। চিনির পরিবর্তে গুড় খাওয়ানো উচিত।

২। শিশুর দৈনন্দিন সমস্যায় মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

শিশু যেমন জাতির ভবিষ্যৎ, সেরূপ শিশুর মা সেই ভবিষ্যৎ-এর সংগঠক। মা যদি তাঁর নিজের ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধান হন তবে সেই শিশুই ভবিষ্যতে জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

আমাদের দেশের মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য নিয়ে যতটা ভাবেন স্বাস্থ্য নিয়ে ততটা ভাবেন না। তাদের ভাবা উচিত স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যই জীবন।

মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির একটা প্রধান কারণ প্রদর রোগ। এই রোগ হ'লে সাধারণতঃ তারা লজ্জায় তা কাউকে বলে না। আবার কেউ কেউ এটাকে রোগ বলেই মনে করে না। আবার কেউ কেউ এটাকে তাঁরা মনে করেন ঋতুস্রাবের মতই এটা যৌবনের একটা ধর্ম। এই রোগ হলে হজম শক্তি ক'মে যায়। অম্ল রোগ দেখা দেয়। শরীর দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকে। অনেক সময় শ্বেতী রোগও দেখা দেয়।

প্রদর রোগে দিনে তিন বার শিবাম্বু পান করা উচিত এবং টাট্‌কা শিবাম্বু একটা কাচের পিচকারীতে নিয়ে যোনির ভিতর দিকটা ভাল ক'রে দিনে দুবার পরিষ্কার করা উচিত। পরিষ্কার হয়ে গেলে পরিষ্কার তুলো বাসি শিবাম্বুতে ভিজিয়ে এক ঘন্টার জন্য ভিতরে রেখে দেওয়া প্রয়োজন। এভাবে সাত দিন করলেই স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কোন পয়সাই খরচ করতে হবে না।

অনেকে মাসিকের সময় শিবাম্বু পান বন্ধ রাখেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। যদি শিবাম্বুর সঙ্গে কিছুটা রক্ত মিশে যায় তাতে কোন ক্ষতি না হয়ে বরং উপকার হবে। ঐ রক্তে তখন প্রচুর হর্মোণ থাকে যা শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

মাতৃজাতির আর একটা সমস্যা ঘন ঘন মাতৃত্ব। বর্তমানে নানারূপ কৃত্রিম পদ্ধতির দ্বারা অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব রোধ করা যায়, কিন্তু সে সব দেহ ও মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে শিবাম্বুকল্প খুব সহজ ও স্বাস্থ্যকর সমাধানের ব্যবস্থা করেছে। তাতে শরীর ও মনের কোনরূপ ক্ষতি না করেই যৌন জীবন উপভোগের সম্পূর্ণ নিরাপদ পথের সন্ধান দিয়েছে।

সহবাসের পূর্বে স্বামী অথবা স্ত্রীর চার দিনের বেশী বাসি শিবাম্বু দিয়ে এক টুকরো তুলো ভিজিয়ে যোনির মধ্যে রেখে সঙ্গমের কিছুক্ষণ পর ঐ তুলো ফেলে দিয়ে ভিতরটা কাচের পিচকারির সাহায্যে টাট্‌কা শিবাম্বু দিয়ে ধুয়ে ফেললে গর্ভ সঞ্চারের ভয় থাকে না। এই সঙ্গে সহবাসের পরে নিজের শিবাম্বু (টাট্‌কা) এক গ্লাস পান করতে হবে। এই পদ্ধতি অব্যর্থ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

যাদের মাসিকের কোন গোলযোগ নেই অর্থাৎ ২৮ থেকে ৩০ দিনের মধ্যেই মাসিক স্বাভাবিক ভাবে হয় তাদের পক্ষে শুধু মাসিক আরম্ভের ১২ দিন থেকে ২০ দিন পর্যন্ত এই নিয়ম পালনীয়, অন্য সময় কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তবে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে এই পদ্ধতিতে ক্ষতি নেই।

মেয়েদের দৈহিক সৌন্দর্য অটুট রাখার জন্য শিবাম্বু পানের সঙ্গে কিছু যোগাসন করা দরকার। তার সঙ্গে প্রত্যহ ভোরে উঠেই কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য দু' গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করা উচিত। অনেকে বেলায় চা পান করে পায়খানায় অভ্যাস করেন। এটা ঠিক নয়। সর্বদা ঘুম থেকে উঠেই পায়খানায় যাওয়া উচিত।

ভোরে সূর্যোদয়ের পূর্বেই বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। সূর্যোদয়ের পর বৃহদন্ত্রে বায়ুর সঞ্চার হয় ফলে কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাই তখন স্বাভাবিক বেগ থাকে না। এজন্য ভোরে উঠেই প্রস্রাব না করে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ উড্ডীয়ান ও পবন মুক্তাসন পর্যায়ক্রমে করে পেটের সঞ্চিত বায়ু বের করে দিলেই পায়খানার বেগ আসবে। ঘুম থেকে উঠে এই বেগ আসার আগেই প্রস্রাব করে এলে আর কোন মতেই বেগ আনা যাবে না। যদি তেমন বেগ না আসে তবে বিপরীতকরণী মুদ্রাসহ উড্ডীয়ান মুদ্রা করলে সহজেই বেগ আসবে।

স্বাভাবিক ভাবে প্রথমবার পায়খানার এক ঘন্টা পর তিন গ্লাস জল পান ক'রে দশ মিনিট হেঁটে এবং হাঁটা অবস্থায় উড্ডীয়ান করলে আবার বেগ হয়ে ঐ জল সমস্ত পেট ধুয়ে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এর দশ মিনিটের মধ্যেই প্রচণ্ড ক্ষিদে পাবে। তখন কিছু জল ও দুধ খেয়ে নিতে হবে। না খেলে ক্ষতি হবে। এইভাবে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়ে দেহে যৌবন চিরস্থায়ী হবে। কোন রোগই দেহ আক্রমণ করতে পারবে না।

স্নানের এক ঘন্টা পূর্বে সারা গায়ে, মাথায় ও পায়ের তলায় বাসি শিবাম্বু মালিশ করলে চামড়া কখনও কুচকে যাবে না। স্নানের পর স্নো ও ক্রীম না মেখে দুধের সর দুহাতে কিছুক্ষণ ঘ'ষে ঐ সর সারা মুখ, ঘাড় ও দুই হাতে ভাল করে ঘষে একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেললে স্বাভাবিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকবে।

এ অবস্থায় শুধু একবার এক কাপ শিবাম্বু পান করলেই স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে। কোন নেশার (যেমন চা, দোক্তা, পান) বশবর্তী হবেন না। পান খেলে শুধু দু'বেলা খাওয়ার পর খাবেন কিন্তু জর্দা বা দোক্তা খাবেন না।

অনেক মা দেহের সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে সন্তানকে দুধ দিতে চাননা, কিন্তু এটা ঠিক নয়। যদি শিশুকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে সামনে ঝুকে দুধ

খাওয়ানো হয় তবে দেহের সৌন্দর্য অটুট থাকে। বিশেষতঃ তাতে স্তনে ক্যান্সার হওয়ার ভয় থাকে না।

শিশু শৈশবে স্বাস্থ্যবিধির সবকিছুর শিক্ষা মায়ের কাছেই পায়। সেজন্য ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে যে, যে হাত শিশুর দোলনা দোলায় সেই হাতই পৃথিবী শাসন করে। এ কারণেই মা তার সন্তানকে শৈশব থেকেই এমন শিক্ষা দিবেন যা তার পরবর্তী জীবন-যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

আহার থেকে আমরা দেহের পুষ্টি সংগ্রহ করি। কিন্তু সেই খাদ্য ভাল ভাবে হজম না হলে দেহ পুষ্ট হতে পারে না। হজমের প্রথম ও প্রধান কাজ মুখে হয়। তাই ছেলেবেলা থেকেই শিশু তার খাদ্যদ্রব্য যাতে ভাল করে চিবিয়ে খেতে অভ্যস্ত হয় সেদিকে মায়ের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পূর্বে ব্রাহ্মণদের খাওয়ার সময় কথা না বলে খাওয়ার রীতি ছিল। অনেকেই তা অন্ধ কুসংস্কার হিসাবে ত্যাগ করেছেন; কিন্তু তা অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্মত। মায়েদের উচিত শিশুকে খাওয়ানোর সময় কথা না বলে ভাল করে চিবিয়ে খাওয়া অভ্যাস করানো। তখন তাদের অফিসের তাড়া থাকে না। তাই যদি এই অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে বড় হয়ে কখনও হজমের গোলযোগে ভুগতে হবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া মায়েদের বিশেষ কর্তব্য।

৩। সুস্বাস্থ্যে ব্যায়ামের বিধি নিষেধ

কৈশোর ও যৌবনই দেহ গঠনের প্রকৃষ্ট সময়। শুধু খাদ্য গ্রহণেই সুস্বাস্থ্য লাভ হয় না। এজন্য কিছু ব্যায়াম ও পরিমিত খেলাধুলার প্রয়োজন। তা হলেই যে বাড়তি খাদ্য গ্রহণ করা হবে তা সহজেই দেহকে পুষ্ট ক'রে যৌবনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। যদি খাদ্য ও ব্যায়ামের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকে তবে তা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। দেখতে হবে, যেন পরিশ্রম অনুযায়ী দেহ উপযুক্ত খাদ্য পায়। তা না হলেই দেহের পক্ষে ব্যায়াম ক্ষতিকর হবে।

সাধারণতঃ যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যে এবং বাইরের নানা আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ব্যায়ামের বাড়াবাড়ি করেই ছেলে-মেয়েরা ব্যায়াম ও খেলাধুলোয় আত্মনিয়োগ করে। হয়ত আপাততঃ এতে ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

হয়ত সাময়িক ভাবে দেহ পুষ্ট হয়, কিন্তু পরিণামে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। সে জন্যই পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ্য বুঝেই খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা উচিত। সাধারণতঃ দৈহিক ব্যায়ামের সঙ্গে যৌগিক আসনাদি ও প্রাণায়াম অভ্যাস করলে জীবনব্যাপী সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারা যায়। নেশায় পড়ে অথবা ঝোঁকের মাথায় কখনও সাধ্যাতীত পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা উচিত নয়।

সপ্তম অধ্যায়

শিবাম্বুকল্পে খাদ্যনীতি

শিবাম্বুকল্পে খাদ্যনীতির গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ অনেক সময় শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করেও যথাযথভাবে খাদ্যনীতি পান না করার জন্য কেউ কেউ নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হন।

আমরা যা খাই তা সরাসরি দেহ গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্য সঠিকভাবে পরিপাক হলে খাদ্যরসে পরিণত হয়। তখন তা রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে দেহ-কোষের পুষ্টি দেয়। তাই দেহের পুষ্টিতে মেদ, মাংস, অস্থি ও মজ্জা সবকিছুই রক্তের উপাদান থেকেই তাদের খাদ্য পেয়ে থাকে।

আমাদের রক্তে দুই জাতীয় উপাদান আছে—(১) অম্লধর্মী (acid) ও ক্ষারধর্মী (alkaline)। শরীরকে সবল রেখে তার ক্ষয় পূরণ করা অম্লধর্মী রক্তের কাজ। শরীরের অস্থি মজ্জা পেশী স্নায়ু ও গ্রন্থিসমূহের সঠিক পরিচালনা ক'রে এবং আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে, দেহকে রোগমুক্ত রাখতে ক্ষারধর্মী রক্তের প্রয়োজন সর্বাধিক। তাই দেখা যায়, দেহে ক্ষারধর্মী রক্তের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই কারণেই সাধারণভাবে আমাদের রক্তের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ ক্ষারধর্মী ও ৩০ থেকে ২০ ভাগ অম্লধর্মী। রক্তে এই আনুপাতিক হার বজায় থাকলে সে সব ব্যক্তি নীরোগ, ধীর-স্থির ও বুদ্ধিদীপ্ত হন। যোগের ভাষায় তারা হন সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন। যাদের দেহে ক্ষারধর্মী উপাদান শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ তারা স্বাস্থ্যসম্পন্ন হলেও সাত্ত্বিক ব্যক্তিদের মত অত ধীর স্থির হতে পারেন না। তারা প্রায়ই আবেগ প্রবণ ও সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারা হন রাজসিক গুণসম্পন্ন। কিন্তু রক্তের ক্ষারাংশ যদি শতকরা ৫০ ভাগের কম হয়ে যায় তবে সেই সব ব্যক্তি হয় তামসিক গুণসম্পন্ন। তারা সুস্থ চিন্তা করতে পারেন না। উত্তেজনার ঝোঁকেই অনেক গর্হিত কাজ করে থাকেন।

দেহে তাদের সহজেই নানা রোগ আশ্রয় নেয়। উচ্চ চিন্তা তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকেন। আধুনিক যুগে খাদ্যনীতির অজ্ঞতায় সমাজে বেশীর ভাগ মানুষ এই তামসিক ভাবাপন্ন। সুতরাং সমাজকে যদি এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে হয় তবে খাদ্য-নীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভ করা দরকার।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ৮ থেকে ১০ শ্লোক দ্বারা সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের বর্ণনা দিয়েছেন। যারা অনুসন্ধিৎসু তারা সেখান থেকে তা দেখে নিতে পারেন। কিন্তু সেখানে খাদ্যনীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা না থাকায় সকলের পক্ষে তা সহজে বোধগম্য হবে না। তাই এখানে আমরা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করবো।

রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রাখার জন্য দেহে ক্ষারধর্মী রক্তের প্রাধান্য থাকা দরকার। রক্তের এই গুণ সাধারণতঃ যাবতীয় ফল, সবুজ শাক, তরিতরকারি, ডাল, বাদাম, দুধ, দৈ ও ঘোল থেকে পাওয়া যায়। এই কারণেই দেহকে সব দিক থেকে সুস্থ রাখতে হলে এই ক্ষারধর্মী খাদ্য খাওয়া একান্ত কর্তব্য।

আজকাল বিজ্ঞানীগণ খাদ্যে প্রোটিন অংশের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। ফলে তাঁরা শাকসব্জীর চেয়ে মাছ, মাংস ও ডিমের উপর বেশী মূল্য দিয়ে থাকেন। এসব আমিষ জাতীয় খাদ্য ভাত, রুটি ও শর্করা থেকে যেসব খাদ্যরস উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে যে রক্ত পাই তা হয় অম্লধর্মী। সুতরাং এজন্য আমাদের দেহের ও মনের গঠন অনুরূপ হয়। এই কারণেই আধুনিক যুগে মানুষের মনে উত্তেজনা ও সহিষ্ণুতার অভাব, কথায় কথায় হত্যা ও মারামারি দেখা যায়। সবই খাদ্যে অম্লধর্মী অংশের প্রাধান্যের ফল।

যারা নিরামিষ-ভোজী তাদের খাদ্যেও তৈল, মাখন, ঘি, ছানা ও মিষ্টির প্রাধান্য দেখা যায়। এসব খাদ্যের খাদ্যরসও অম্লধর্মী রক্ত উৎপন্ন করে। সুতরাং নিরামিষ ভোজী পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসায়ীগণ আমিষ না খেয়েও অম্লধর্মী নিরামিষ আহারের প্রভাবে মানসিক দিক থেকে উন্নত হতে পারেন না।

অম্লধর্মী খাদ্য হজম হওয়ার জন্য দেহের নানা গ্রন্থিকে অতি ক্রিয়াশীল হতে

হয়। ফলে, সেই সকল গ্রন্থিসমূহ সহজেই দুর্বল হয়ে পড়ে। এজন্য দেহ রোগাক্রান্ত হয়। এসব ব্যক্তি সহজেই রক্তচাপ ও বহুমূত্রের শিকার হন। অম্লধর্মী খাদ্য থেকে যে অম্লবিষ (Uric acid) উৎপন্ন হয় তাতে দেহে অন্যান্য ক্ষতির সঙ্গে দুরারোগ্য বাতব্যাধি (Rheumatism) সৃষ্টি করে। এই কারণেই শিবাম্বু-সেবীকে অবশ্যই ক্ষারধর্মী খাদ্যে অভ্যস্ত হতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত নিয়ম অবশ্য পালনীয়।

১। টক্, ঝাল ও মশলা যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে।

২। দুধ অবশ্য খাদ্য হিসাবে গ্রহণীয়। তবে গুড়া দুধ বা টিনের ঘন দুধ (condensedmilk) বা প্যাষ্টুরাইজড্ (Pasteurised) দুধ ক্ষতিকর। তাতে অম্লদ্বারা পেটে বায়ু সৃষ্টি করে।

৩। চিনির পরিবর্তে গুড় খেতে হবে।

৪। দৈ বা ঘোল খুব টক হলে চলবে না। তবে লেবু চলবে।

৫। রান্নার ভিতর ছাড়া আলাদা লবণ বর্জনীয়।

৬। আদা খাওয়া যাবে। তাতে বায়ু নাশ হয়, হজমে সাহায্য করে এবং তা ক্ষুধা বর্ধক।

৭। কোনরূপ ভাজা জিনিষ খাবেন না।

৮। শিবাম্বু পানের এক ঘন্টার মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। আবার খাদ্য গ্রহণের তিন ঘন্টার মধ্যে শিবাম্বু পান নিষিদ্ধ।

৯। সকালে জল খাবার হিসাবে চা, কফি, মাখন, বিস্কুট না খেয়ে ছোলা, সয়াবীন, কিসমিস, বাদাম ইত্যাদি চিবিয়ে বা বেটে সরবৎ করে খাওয়া অনেক উপকারী।

২। নিরামিষ আহারের বৈজ্ঞানিক যুক্তি

আমাদের দেহের শক্তির উৎস খাদ্য। অনাহারে থাকলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। খাদ্য কি ক'রে আমাদের শক্তি যোগায় তা বুঝতে পারলেই আমাদের প্রকৃত খাদ্য কি হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা সহজ সাধ্য হবে।

বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, বিশ্বচরাচরে যে শক্তির লীলা আমরা সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ করি তার উৎস হচ্ছে সূর্য। সমস্ত বস্তুই সূর্য থেকে শক্তি আহরণ করে। তাই কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি শক্তির উৎস নিঃশেষিত হলে সূর্য থেকেই শক্তি আহরণ করার উপায় উদ্ভাবনে সকল দেশের বৈজ্ঞানিক

মহল সচেষ্ট হয়েছেন।

যদিও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য শক্তির প্রয়োজন, তবুও আমাদের দেহ সূর্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি আহরণ করতে পারে না। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে সূর্যের আলোর সাহায্যে দেহে ভিটামিন উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেহেতু সূর্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমরা শক্তি সংগ্রহ করতে পারি না, সেইজন্যই খাদ্যের মাধ্যমে সেই শক্তি সংগ্রহ করতে আমরা বাধ্য হই। আমাদের সেই শক্তি থাকলে শুধু সূর্যের আলোর সাহায্যেই আমরা আমাদের দেহের পুষ্টি সংগ্রহ করতে সমর্থ হতাম।

এই কারণে যারা সূর্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে শক্তি সংগ্রহ করতে পারে তাদের উপরই আমাদের দেহের পুষ্টি ও শক্তির জন্য নির্ভর করতে হয়।

প্রকৃতিতে একমাত্র উদ্ভিদ্-জগৎ তাদের পাতার বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূর্যের শক্তি তাদের দেহে সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারে। এই কারণেই আমাদের দেহের শক্তি ও পুষ্টির জন্য আমাদের উদ্ভিদ জগতের উপর নির্ভর করতে হয়। উদ্ভিদের উপরই তৃণভোজী পশুদেরও বেঁচে থাকতে হয়। তাই জীব-জগৎ প্রত্যক্ষভাবে সূর্যের শক্তি আহরণ করতে না পারলেও শাক-সব্জীর মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরে সেই শক্তি লাভে সমর্থ হয়। মাংসাশী হিংস্র প্রাণীগণ শাক-সব্জী খেতে পারে না বলে তারা তাদের আহার্য তৃণভোজী প্রাণীর দেহ থেকে সংগ্রহ করে। তাই বাঘ, সিংহের মত হিংস্র প্রাণী কখনও মাংসাশী প্রাণী খায় না। তারা খায় হরিণ, গরু, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী। কারণ তারাই একমাত্র তাদের দেহের শক্তি ও পুষ্টি জোগাতে পারে। একমাত্র রেগে গেলেই তারা শেয়াল কুকুরের মত মাংসাশী প্রাণী হত্যা করে—খাদ্যের জন্য কখনও নয়।

মাংসাশী প্রাণীর দাঁতের গঠন তৃণভোজীদের চেয়ে আলাদা। তাদের দাঁতগুলি বেশীর ভাগ ছুঁচালো—যা দিয়ে তারা মাংস ছিঁড়ে ফেলতে পারে অতি সহজেই। কিন্তু মানুষের ৩২টি দাঁতের মধ্যে মাত্র চারটি ছুঁচালো—যাকে বলা হয় শ্বাদন্ত (canine teeth)। ঐ দাঁত মাংস খেতে সাহায্য করে। এ থেকে বুঝা যায়, প্রকৃতি মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মাংসাশী করে সৃষ্টি করেনি। মানুষ যখন নিরামিষ খাদ্য পাবে না তখনই আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ঐ দাঁতের ব্যবহার করতে পারবে। মাংসাশী জীবের পক্ষেও এরূপ আপৎকালীন ব্যবস্থা আছে।

আমরা দেখেছি, বিড়াল ও কুকুর মাংসাশী হলেও মাংসের অভাব হলে তারা ডাল, ভাত রুটি খেয়েও জীবন ধারণ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তাদের খাদ্য আমিষ। মাংসাশী জীবের দেহে নিরামিষ ভোজী প্রাণীর তুলনায় অম্লধর্মী রস ও রক্ত বেশী। এই রস ও রক্ত আমিষ খাদ্য জীর্ণ হতে সাহায্য করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, আমিষ ভোজী জন্তুর যকৃৎ (Liver) থেকে অনেক বেশী পরিমাণ পাচক পিত্ত (Urea Bile) নির্গত হয় বলে আমিষ জাতীয় খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় এবং আমিষ খাদ্যের দূষিত অংশ মলমূত্রের মাধ্যমে বর্হিগত হয়। কিন্তু মানুষের যকৃৎ আমিষ খাদ্য জীর্ণ করার উপযোগী পাচক পিত্ত তত পরিমাণে নির্গত করতে পারে না বলে আমিষের বিষাক্ত রস (Uric Bile) দেহ থেকে বের হতে না পেরে দেহে নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে বাত-ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই, প্রকৃতিজাতভাবে মাংস বা আমিষ খাদ্য মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য হতে পারে না।

অনেকের মতে, দেহ গঠনের পক্ষে যে প্রোটিন প্রয়োজন তা নিরামিষ ডাল বা শাক-সব্জী থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দুধ আমাদের দেহ গঠনের পক্ষে একটি সুষম উপাদান। মাংসের ভিতর যে প্রোটিন পাওয়া যায় দুধের মধ্যেও তা পাওয়া যায়। অধিকন্তু, এতে দেহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী অম্লরসের আধিক্য (Uric Acid) থাকে না। ফলে, মাংস থেকে যেসব রোগ সৃষ্টি হয় দুধের মাধ্যমে তা দেহে প্রবেশ করতে পারে না।

আমিষ খাদ্যের প্রভাব দেহের চেয়ে মনের উপর বেশী পড়তে দেখা যায়। যে কোন প্রাণী যখন আক্রান্ত হয়ে ক্রুদ্ধ হয় তখন তাদের রক্তে এক প্রকার বিষের সৃষ্টি হয়। তাই, ক্রুদ্ধ জন্তু যখন কামড়ায় তখন ক্ষতস্থানে সে বিষ প্রবেশ ক'রে তাতে আক্রান্ত প্রাণীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

আমরা যখন মাছ বা কোন পশু আহারের জন্য বধ করি তখন নিষ্ফল প্রতিহিংসার দরুণ তাদের দেহের রক্তে যে বিষের সঞ্চার হয় তা আহার্য হিসাবে আমাদের মনেও সেরূপ হিংসার বীজ বপন করে। এই কারণেই মাংস ভোজী সৈনিকদের মধ্যে অনর্থক হিংসা সৃষ্টি করার জন্যই তাদের খাদ্যে মাংসের প্রাধান্য দেওয়া হয়। আজকাল সমাজে কথায় কথায় ঠাণ্ডা মাথায় নর-হত্যার একমাত্র কারণ অত্যধিক মাংস ও আমিষ জাতীয় খাদ্য ভোজন। হিংসা-বিষ

যুক্ত মাংস খাওয়ার দরুণ মানুষের মনে অকারণে হিংসার উদ্রেক হয় এবং মানুষ হত্যা করায় তাদের চিত্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। নিরামিষ ভোজী কখনও এরূপ হিংসা প্রবণ হতে পারে না। এজন্য মনুষ্য সমাজকে এই পাশবিকতার হাত থেকে উদ্ধার ক'রে দেব সমাজে পরিণত করতে হলে খাদ্যাভাস পরিবর্তন সর্বাগ্রে দরকার। জীব হিংসা থেকে যে খাদ্য তৈরী হয় তা বর্জন করতে না পারলে মনুষ্য সমাজের উদ্ধার হবে না মনুষ্যত্বকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমিষ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নিরামিষ আহার বেছে নিতে হবে। তাতে শুধু মানসিক দিক থেকে মালিন্য মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে না দেহকেও নানা রোগের কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারা যাবে। মাছ মাংস খেতে যা খরচ হবে তার চেয়েও কম খরচে দুধ ও অন্যান্য নিরামিষ খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

৩। শিবাম্বু কল্পে দৈনন্দিন জীবন

যারা কোনরূপ রোগাক্রান্ত নন তারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নীরোগ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করলে শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করতে পারেন।

ভোরে উঠে প্রথমবারের শিবাম্বুর প্রথম ও শেষাংশ বাদ দিয়ে মধ্যের অংশ পান করবেন। তার এক ঘন্টা পর প্রাতরাশ গ্রহণ করবেন। দাঁত মাজার সময় টাট্‌কা শিবাম্বু দিয়ে কুলকুচা করে নিলে দাঁতের কোন রোগ হবে না এবং মাড়ি মজবুত হবে। যাদের পায়োরিয়া আছে তারা বাসি শিবাম্বু দিয়ে মাড়ি মালিশ করবেন। তাতে তাড়াতাড়ি ঐ রোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন।

যারা সুস্বাস্থ্যের জন্য শিবাম্বু পান করবেন তারা প্রথম কয়দিন প্রাতরাশ বন্ধ রেখে সকালে দু'বার শিবাম্বু পান করবেন। অবশ্য দ্বিতীয় বার পান করার পর অন্ততঃ একঘন্টা ব্যবধানে মূল আহারের মত সময় হাতে রাখতে হবে।

জল খাবার সাধারণতঃ ফল দিয়ে করবেন। ফল ও মধু শিবাম্বুকল্পে বিশেষ প্রয়োজন। মশলা যুক্ত খাবার কখনও খাবেন না। ঝাল একেবারে বর্জনীয়।

রাত্রি জাগরণ শিবাম্বু-সেবীর পক্ষে অনুচিত। রাত্রি দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন। শেষ রাত্রি চারটায় ঘুম ভাঙলে উঠে পড়বেন। শিবাম্বুকল্প মনকে অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়। তাই, ঐ সময় সাধন ভজন খুব ফলপ্রসু হয়। যে

কোন অবস্থায় সূযোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করা উচিত।

যারা কোনরূপ নেশায় অভ্যস্ত হয়ে শত চেষ্টা করেও ঐ নেশার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারছেন না তারা যদি শিবাম্বুকল্প গ্রহণ ক'রে নাক দিয়ে অন্ততঃ প্রথমবারের শিবাম্বু পান করেন তবে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঐ নেশার হাত থেকে মুক্তি পাবেন। নস্যি ও ধূমপানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বহুক্ষেত্রে পরীক্ষিত। যারা মদ ও অন্যান্য নেশায় অভ্যস্ত তারাও কিছু দিনের মধ্যেই ঐ নেশার প্রতি আসক্তি হারিয়ে ফেলবেন।

যদি এভাবে জীবন পরিচালিত করেন তবে জীবনের শান্তি আপনা থেকে করায়ত্ত হবে। এই শান্তিই জীবনের পরমার্থ-লাভে সহায়ক হবে।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

❑ পরিশিষ্ট ❑

শিবাম্বুর শক্তিকরণ (Potentisation of Auto-Urine)

শিবাম্বুকল্পের নানা পরীক্ষায় দেখা গেছে, শিবাম্বু পান দ্বারা দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের রোগকৃত অবরোধ দূর ক'রে দেহ কোষের পুষ্টি সাধন করে। যে সব রোগ-জীবাণু শিবাম্বু মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে তা থেকে দেহে রোগ প্রতিরোধী (anti-body) শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু পুরাতন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনী শক্তি ভীষণভাবে হ্রাস হয়ে পড়লে এই পদ্ধতিতে সব সময় পূর্ণ সুস্থ হওয়া যায় না। সেই সব ক্ষেত্রে শিবাম্বু শক্তিকরণ অত্যাবশক হয়ে পড়ে। তা হলে শক্তিকৃত শিবাম্বুর জীবনী-শক্তিকে উজ্জীবিত ক'রে রোগ অতি সত্বর নির্মূল করতে সাহায্য ক'রে সাধারণ শিবাম্বু দ্বারা দেহের ক্ষয় পূরণ করতে সমর্থ হবে। ফলে রোগ আরোগ্য ত্বরান্বিত হবে। বিশেষতঃ শিবাম্বুপানের পর যদি কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তখন শিবাম্বুপান বন্ধ রেখে মালিশ ও শক্তিকৃত শিবাম্বুপানে ঐ সব প্রতিক্রিয়া সহজে দূর হয়। যারা সংস্কারবশতঃ শিবাম্বুপানে সঙ্কোচ বোধ করেন তাদের পক্ষে শক্তিকৃত শিবাম্বুপান অতি সহজ হবে।

শিবাম্বুর শক্তিকরণ প্রণালী

একটি পরিষ্কার শিশিতে সমান দশটি ভাগ করা কাগজের দাগ লাগিয়ে নিন। সাধারণতঃ রুল করা কাগজের দশটি দাগ বা লাইন টানা সরু টুকরো লাগালেই সুবিধা হবে। তার নীচের একটি দাগ শিবাম্বু দিয়ে পূর্ণ করে বাকী নয়টি দাগ বিশুদ্ধ জল দিয়ে পূর্ণ করুন। তারপর শিশিটিকে দশ বার হাতের তালুতে আঘাত করুন। এবার সকালে ঐ মিশ্রণ থেকে তিন দাগ খেয়ে বিকেলে বা সন্ধ্যায় তিন দাগ ও শোবার সময় তিন দাগ খেয়ে শোবেন। শিশিতে যে এক দাগ বাকী থাকবে তাতে পরের দিন আবার নয় দাগ জল মিশিয়ে আগের দিনের মত তিন বারে নয় দাগ পান করবেন। এভাবে পাঁচ দিন চলার পর পরের দিন আবার এক দাগ শিবাম্বুর সঙ্গে নয় দাগ জল মিশিয়ে মিশ্রণ ক'রে পূর্বের মত পান করে যাবেন। শরীরের উন্নতি হলে ক্রমে ছয় দিন সাত দিন পর পর নতুন শিবাম্বু মিশ্রণ করবেন। প্রথম ব্যবহারকারী এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হলে পরে শিবাম্বুপানে আর অসুবিধা বোধ করবেন না। প্রতিবার খাওয়ার পূর্বে দশ বার করে শিশিটিকে হাতের তালুতে আঘাত ক'রে ঝাঁকিয়ে নিবেন। প্রতিদিন মিশ্রণের মধ্যে তিন ফোঁটা করে পরিশ্রুত সুরাসার (rectified spirit) দিয়ে দিবেন।

দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে শিবাম্বুর সঙ্গে শক্তিকৃত শিবাম্বুপান করলে রোগারোগ্য ত্বরান্বিত হবে।

শিবাম্বুর খাদ্য নীতি

শিবাম্বুবিধি অনুসরণ করলে খাদ্যনীতি কঠোরভাবে মানতে হবে, তা না হলে দেহে এমন সব জটিলতা দেখা দিবে তা থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় লাগবে। সেই কারণেই খাদ্যনীতি কঠোরভাবে মানা দরকার। তা না হলে শিবাম্বু বিধিতে নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন মাথা ঘোরা, পেটে বায়ু, হজমের গোলমাল, শারীরিক দুর্বলতা। তা থেকে মুক্তি পেতে সময় লাগবে। পেটের বায়ু জমার জন্য ঘুমের ব্যাঘাতই সব চেয়ে বেশী কষ্ট দেয়। বিশেষ করে খাদ্য নীতি না মানার জন্য লোভের বশে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী খেয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা দেয়। তাতেই দেহে অম্লরস উৎপন্ন হয়ে দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ সহজেই উত্তেজনা প্রবণ হয়। কথায়

কথায় রেগে অনেক খারাপ ও অসামাজিক কাজ করে ফেলে। আধুনিক সমাজে এই কারণেই কেউ কারো কথা সহ্য করতে পারে না। কথায় কথায় খুন জখম হয়।

রান্নার সময় তাপে অনেক সময়ই খাদ্যের প্রাকৃতিক গুণ নষ্ট হয়ে যয়। সেই জন্য শিবাম্বুসেবীকে রান্না করা খাবার যথাসম্ভব বর্জন করা দরকার। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এই জন্য রান্না করা খাবার খেতেন না। তাপে খাদ্যের প্রকৃত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভাবের আদি পর্বে টাটকা খাদ্যই খেত। মশলা দিয়ে রান্না করা পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে। তাই শিবাম্বুবিধি অনুসরণ করলে খাদ্যের ব্যাপারে খুব সতর্ক হতে হবে।

আমরা খাদ্যের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করি। সে জন্য চিনি অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু শিবাম্বুবিধি অনুসরণ করলে চিনির পরিবর্তে গুড়ের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। এই কারণে চা, পরিষ্কৃত সাদা ময়দা, পাউরুটি, বিস্কুট, কেক, চাটনী, আচার, ভাজা জিনিষ, অতিরিক্ত নোনতা খাদ্য সর্বদা বর্জন করতে হবে। তা ছাড়া বিড়ি, সিগারেট, তামাক, অতিরিক্ত ঝাল, নোনতা, ও মশলাযুক্ত খাবার কখনই খাবেন না।

এই কারণে শিবাম্বু-সেবীকে নিম্নলিখিত খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ—

(১) হাতে করা রুটি (ভূষি সহ) গম বা বাজরা থেকে।

(২) বাদাম ও মশলাশূন্য শিমজাতীয় সিদ্ধ করা খাদ্য।

(৩) ঢেঁকি ছাঁটা চালের ভাত, খিচুরিও খাওয়া যেতে পারবে।

(৪) অঙ্কুর গজান ছোলা, বাদাম বা মুগ ডাল নারকেল ও গুড় দিয়ে। এতে রক্তের লোহিত কণিকা বৃদ্ধি ক'রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। স্বাস্থ্য দীর্ঘদিন অটুট থাকে।

(৫) প্রত্যহ সকালে ২০০ গ্রাম দুধে ২ চামচ মধু মিশিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য অটুট থাকে।

(৬) ঘরে পাতা টাটকা দই খুব ভাল। তাতে স্বাদের জন্য সামান্য গুড় মিশিয়ে নিতে পারা যাবে।

(৭) টাটকা তরকারির স্যালাড, এসব ছাড়া

(৮) সমস্ত পাকা মিষ্টি ফল।

(৯) শুকনো খেজুর, বাদাম, কিসমিস কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে নরম করে খেলে উপকার হবে।

পারিত্যজ্য খাদ্য —

ময়দার তৈরী সমস্ত খাদ্য, মাছ, মাংস, পাপড় ভাজা, অতিরিক্ত ঝাল বা নোনতা খাদ্য। তাছাড়া ভেজিটেবল ঘি।

সমস্ত রকমের মিঠাই।

শিবাম্বু বিধির মাত্রা

সাধারণভাবে শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত রাখার জন্য প্রত্যহ ভোরে ১ গ্লাস (২০০ - ২৫০ এম.এল) শিবাম্বু খেলেই চলবে। কেউ কেউ অবশ্য বিকেলে খালি পেটে আর এক গ্লাস খেতে পারেন। বেশী খেলে উপকার ছাড়া অপকার হবে না। খুব ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে ২ চামচ থেকে ওষুধ খাওয়া গ্লাসের এক গ্লাস খাওয়ান যেতে পারে। তা হলেই তারা রোগমুক্ত থাকতে পারবে। তবে পান করার সময় সর্বদাই টাটকা শিবাম্বু খেতে হবে।

যদি সর্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি রোগ হয় তবে নিম্নলিখিত নিয়মে তা ব্যবহার করতে হবে —

১) রোগের চিকিৎসার প্রথমেই কোষ্ঠ শুদ্ধির প্রয়োজন। পিচকারি দ্বারা (শিশুর ক্ষেত্রে) অথবা ডুচ দ্বারা বাসি শিবাম্বুর সঙ্গে সম পরিমাণ জল মিশিয়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করলে যে কোন কঠিন অসুখও অঙ্কুরেই বিনাশ হবে।

২) তা ছাড়া সত্ত্বর রোগ মুক্তির জন্য ২/১ দিন শিবাম্বু উপবাস করা দরকার। তাতে রোগের গ্লানি থেকে সত্ত্বর মুক্ত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারা যাবে। রোগের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে না। উপবাস ভঙ্গের প্রথম দিন ফলের রস এবং পরের দিন খিচুরি খাওয়া বাঞ্ছনীয়। দুদিন পরে রোগের গ্লানি সেরে গেলে স্বাভাবিক খাদ্য খেতে পারা যাবে। যারা উপবাস করতে বা ডুচ্ নিতে পারবে না তাদের অসুস্থ অবস্থায় অন্ততঃ ৪/৫ বার শিবাম্বু পান করা দরকার। এতে পয়সা খরচ নেই অথচ সম্পূর্ণরূপে সুস্বাস্থ্য পুনরায় ফিরে পাবেন।

পুরাতন ও জটিল ব্যাধির যেমন ক্যানসার, বাতরোগ, হাঁপানী, হৃদরোগ ইত্যাদির জন্য।

১) প্রথমে ডুচ্ Douche দ্বারা শিবাম্বু ও জল মিশিয়ে দুদিন অন্তর ৩/৪ দিন পেট পরিষ্কার করতে হবে। সেই সঙ্গে ৩/৪ দিন শিবাম্বু উপবাস অবশ্যই করতে হবে। রোগের দরুণ যদি নিজের প্রস্রাব কমে যায় তবে অপর সুস্থ ব্যক্তির শিবাম্বু খেতে হবে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রস্রাবই পুরুষ খাবে এবং মেয়েদের প্রস্রাব মেয়েরা। সঙ্গে ৭/৮ গ্লাস জল। এতেই ৪/৫ দিনের মধ্যে রোগ মুক্ত হয়ে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরে পাবে এবং স্বাভাবিক ক্ষিদে হয়ে দেহে পূর্বের কর্মক্ষমতা চলে আসবে। রোগের অবস্থায় উপবাস করলেও রোগী দুর্বল হবে না কারণ দেহের উপযোগী পুষ্টি শিবাম্বু থেকেই আসবে। তবে রোগী যদি আগে থেকেই খুব দুর্বল হয়ে থাকে তবে তিনি তরল খাদ্যের সঙ্গে শিবাম্বু খেয়ে যাবেন। এই সময় ফলের রস ও সব্জির সিদ্ধ রস, খাওয়া চলবে।

পরিশিষ্ট

শক্তিকৃত শিবাম্বুর প্রয়োগ

অনেক পুরানো জটিল রোগে শুধু শিবাম্বু পানে ততটা গভীরে কাজ করতে পারে না। সেই সব ক্ষেত্রে শিবাম্বু পানের সঙ্গে শক্তিকৃত শিবাম্বু পানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যে সব ক্ষেত্রে রোগ অত্যন্ত পুরানো ও অত্যন্ত জটিল সে সব ক্ষেত্রে মূল শিবাম্বু (Crude Urine) পানের সঙ্গে শক্তিকৃত শিবাম্বু পান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা ছাড়া যারা সংস্কারাচ্ছন্ন ঘৃণা ত্যাগ করে মূল শিবাম্বু পানের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে পারেন না তারাও শক্তিকৃত শিবাম্বু পান দিয়ে শুরু করে মূল শিবাম্বু পানে অভ্যস্ত সহজেই হতে পারবেন। এইরূপ প্রয়োগ বিধিকে হ্যোমিওপ্যাথিক প্রয়োগ বলে। এই শক্তিকৃত প্রয়োগে প্রধানতঃ দেহে রোগ বিরোধী শক্তির আবির্ভাব হয়ে রোগ নিরাময় ত্বরান্বিত করে। কিন্তু শিবাম্বু বিধির উদ্দেশ্য শুধু রোগ নিরাময় নয়। রোগারোগ্যের পর দেহের পুষ্টি সাধনও এই চিকিৎসা বিধির উদ্দেশ্য। তাই শক্তিকৃত শিবাম্বু প্রথমে পান করতে অভ্যস্ত হলে পরে মূল শিবাম্বু পানে অনীহা সহজেই দূর হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাদের দেহে কোন না কোন রোগ কোন যন্ত্রণা না দিয়েও দেহে বাসা বাঁধতে থাকে। সে সব ক্ষেত্রে শক্তিকৃত

শিবাম্বু পান সকলের পক্ষেই আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই শক্তিকৃত শিবাম্বু পান দিয়েই এই চিকিৎসা আরম্ভ করা প্রয়োজন। যারা প্রথম থেকেই মূল শিবাম্বু পানে অভ্যস্ত তাদের পক্ষেও। তারা মূল শিবাম্বু খুব ভোরে ও বিকেলে শক্তিকৃত শিবাম্বু পান করবেন সকাল সাড়ে আটটায় ও রাত্রি সাড়ে আটটায়। এতে রোগ নিরাময় ত্বরান্বিত হয়।

জার্মানীতে অনেক অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার এলার্জি, সিফিলিস, গণোরিয়া প্রভৃতি রোগে রোগীর দেহে এই পদ্ধতিতে শিবাম্বু ইনজেক্সনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে খুব সহজে বিষ্ময়কর ফল পেয়েছেন। আমার পরিচিত এক এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার তার প্রিয় কুকুরের দেহের লোম পড়ে গেলে এই পদ্ধতি প্রয়োগে কুকুরটিকে আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে ফিরিয়ে এনেছেন।

পৃথিবীর নানাস্থানে শিবাম্বু-বিধির চিকিৎসা কেন্দ্র

ভারত

১। **গোত্রী নিসর্গোপচার কেন্দ্র**
বিনোবা আশ্রম
গোত্রী রোড, বরোদা - ৩৯০০২১
ফোন - ৩৩৮ ২৪৫ / ৩১৩৪৬৩

২। **শিবাম্বু নেচার কিওর হোম**
ডঃ রাজ উপাধ্যায়, জাহাঙ্গীর পুরা
বন্দর রোড, সুরাট - ৫,
ফোন ৬৮৫ - ৩৯৮

৩। **শিবাম্বু যোগ নেচার কিওর সেন্টার**
ডাঃ সারং পাটিল, শিবাম্বু ভবন
ভাসি গকা রোড্,
কোলাপুর - ৮১৬ ০১২
ফোন - ৬২১৭৬৬/৬২১৫৬৫

৪। **শিবাম্বু চিকিৎসা ভবন**
রাষ্ট্রীয় শালা কম্পাউণ্ড নং ২
হেলভাই দাভে মার্গ
রাজকোট - ৩৬০০০২,
ফোন ৪৬০৭৬

৫। **শিবাম্বু গবেষণা কেন্দ্র**
Water of life foundation
(India)
Chairman-Dr. G. K. Thakkar
55/409 Adarsh Nagar
Worli, Mumbai - 400 025
Phone 4229259

৬। **Water of Life Foundation India**

Pooja Maternity & Nursing Home
103-105 Shree Santoshi Mata Co-operative Society Ltd.
Mumbai - 400 084

৭। **স্বপন চট্টোপাধ্যায়**
পি/১-ডি, ডাঙ্গাপাড়া, কাঁচরাপাড়া
(উ) ২৪ পরগনা ৭৮৩১৪৫

৮। **ভারত সেবক সমাজ**
গুজরাট, পাকোঁড় নাকা
আমেদাবাদ ৩৮০০১

৯। **বিহার স্কুল অব যোগ**
গঙ্গা দর্শন
মুঙ্গের ৮১১ ২০১ বিহার

১০। **শ্রীলতা স্বামীনাথন**
৩৫ ধুলেশ্বর গার্ডেন্স
সরদার প্যাটেল রোড,
জয়পুর - ৩০ ২০০৯
ফোন - ৩৬৪ ৭৫৯

ভারতের বাইরের গবেষণা কেন্দ্র

USA

1. **Lifestyle Institute.**
(Water of Life foundation, USA)
Dr. Beatrice Barnett.
P.O. Bon - 4735
Ruidoso NM 88345
USA
Tel - 501-2573405

2. **Australia**
Jara E Eich
P.O. Box 1491
Too Woomba
Queens Land 4350
Australia

3. **Nikaragua**
Atam Inove
Centro Cohnan
Apartards Postal 573
Leon
Nicaragua C.A.

4. **England**
Coen Van der Kroon
C/o Amettyst Books
Lime Tree House
Swalcliffe Bonbury
Oxfordshire OX ISSEH
England.

শিবাম্বু ব্যবহারকারীদের নিজস্ব মন্তব্য

শিবাম্বুকল্প চিকিৎসা কি ?

স্বমূত্রের তান্ত্রিক নাম শিবাম্বু। শিব অর্থ মঙ্গলদায়ক, অম্বু মানে জল। স্বমূত্র দ্বারা দেহকে চিরদিন নীরোগ রেখে মানুষ সাধনার দ্বারা ইষ্টলাভ করতে পারে। এই অমূল্য চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণকে শিবাম্বুকল্প বলে।

শিবাম্বুকল্প চিকিৎসার প্রাচীনত্ব ও দেশ বিদেশে এর প্রচার ও প্রসার ।

শিবাম্বুকল্প অতি প্রাচীন। মিশর, গ্রীক ও চীন দেশে সুদূর অতীতে এই চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচার ছিল। ভারতে ডামরতন্ত্র ও ভাবপ্রকাশে এই চিকিৎসা পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। এখনও আউল, বাউল ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে গুপ্তভাবে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। লোকলজ্জার ভয়ে অনেকে গোপনে শিবাম্বুকল্প গ্রহণ করে থাকেন।

শিবাম্বুকল্প চিকিৎসার কার্যকারিতা ।

এই পদ্ধতির চিকিৎসায় রোগ প্রতিরোধী শক্তি সৃষ্টি ক'রে রোগকে সমূলে নির্ম্মূল করে। অধিকন্তু মূত্রের পুষ্টিকর উপাদান দেহ গ্রহণ ক'রে দেহ পুষ্ট হয় ও রোগ আরোগ্য ত্বরান্বিত করে। ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য।

শিবাম্বুকল্প চিকিৎসা কেন গ্রহণ করব ?

অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে ঔষধ ও তার মাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হ'লে নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে। শিবাম্বুকল্পে সেই বিপদের আশঙ্কা নাই। অন্যসব চিকিৎসা বিধিতে অর্থ, ঔষধের বিশুদ্ধতা ও সহজলভ্যতা অবশ্যই চিন্তনীয়। কিন্তু শিবাম্বুকল্পে এ বিষয়ে কোন চিন্তার কারণ নাই। ইহা সহজলভ্য। সুস্থ দেহে, দীর্ঘদিন বাঁচতে হ'লে ইহা গ্রহণ করতে হবে।

Price Rs. 20.00 only